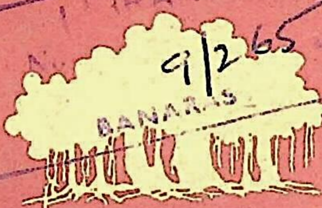
দেবভূমি বক্রেশ্বর



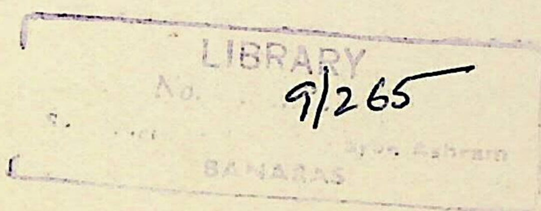








প্রেমদাস তীর্থঙ্কর
(গুহাবাসী)

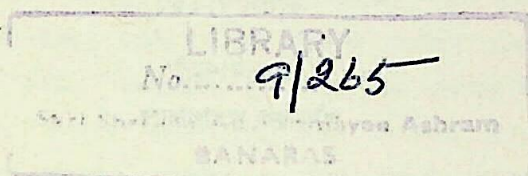
15-2-78				


LIBRARY
No. 9/265
BANARAS

দেবভূমি বক্রেশ্বর



দেবভূমি বক্রেশ্বর



প্রেমদাস তীর্থংকর
(গুহাবাসী)

পরিবেশক ঃ
জিজ্ঞাসা
২এ, কলেজ রো, কলকাতা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯।

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭১

প্রকাশক
মণি চক্রবর্তী
২২।১।১।২, মনোহর পুকুর রোড,
কলিকাতা-২৯।

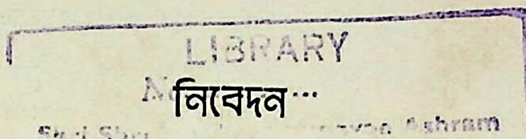
প্রচ্ছদশিল্পী
জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রশিল্পী
মণি চক্রবর্তী

মুদ্রক
বীরেন সিমলাই
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলকাতা-১৩।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ক্যালকাটা জব প্রেস (প্রা) লিঃ

পাঁচ টাকা



নিবেদন…

প্রেমদাস তীর্থংকর সর্বত্যাগী মহাপুরুষ। এই গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিক। মানবস্মৃতি থেকে লুপ্তপ্রায় বক্রেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য প্রচার-ই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসীর লৌকিক পরিচয় অপ্রয়োজনীয় এবং সে কাজে অগ্রসর হওয়াও আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। আজ কালীঘাট তীর্থের মাহাত্ম্য যে-কারণে লোক সমাজে কীর্তিত, সতীদেহের ছিন্নাংগের স্পর্শে এই বক্রেশ্বরতীর্থও দৈবালোকিত। বস্তুত, লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রে আমরা অবগত হয়েছি যে এই চিন্ময়ধাম বক্রেশ্বরে চৌদ্দ বৎসর ধরে যখন তিনি একনিষ্ঠ তপস্যাব্রতী, সেই সময় তিনি দেবাদিষ্ট হন, "কাশীতে কাশীমাহাত্ম্য, জগন্নাথে জগন্নাথমাহাত্ম্য তদ্রূপ বক্রেশ্বরে বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা আবশ্যক। তৎসঙ্গে এ তীর্থে লুপ্তপ্রায় সপ্তমনীষীর জীবনী সংযোজিত রহিবে।" ফলত, যুগে যুগে মহাপুরুষগণের পাদস্পর্শে কী ভাবে এই বক্রেশ্বর তীর্থ দেবভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রেমদাস তীর্থংকরের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যস্থতায় এই তীর্থের সেই পরিচয় সুপরিস্ফুট।

প্রেমদাসজী সাহিত্যিক নন। তিনি সর্বত্যাগী মুক্ত পুরুষ। প্রথম জীবনে পিতার নিকট সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কলকাতায় গঙ্গা স্নানান্তে প্রত্যহ কখনো বা উদয়াস্ত, কখনো বা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কালীঘাট মন্দিরের একান্তে—কেওড়াতলা শ্মশানভূমিতে তিনি সাধন কর্মে ব্রতী থাকতেন। একদা প্রেমদাসজী কালীঘাট থেকে যাত্রা ক'রে বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমান্তে রাজপুতানায় আজমীর নগরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি বৃহৎ জলাশয় পুষ্কর তীর্থে যান। এই স্থানেরই সন্নিকটে দীর্ঘ ও বিস্তৃত নাগ পাহাড় অবস্থিত। একাদশ শৃঙ্গশোভিত এই নাগ পাহাড় সংলগ্ন একাদশটি কুণ্ড আছে। নিম্নভূমিতে পতিত সেই কুণ্ডনিঃসৃত শীতল জলধারায় অবিশ্রান্ত গতি একটি লক্ষণীয় দৃশ্য। ঐ সব গিরি-চূড়ার বিভিন্ন অংশ আশ্রয় ক'রে কুণ্ডসংশ্লিষ্ট গিরিগহ্বরে অগস্ত্য, জামদগ্ন্য, গৌতম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিগণ পূর্বে তপস্যা করেছিলেন—এইরকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যাইহোক, উক্ত নাগ পাহাড়ের এক শৃঙ্গে জামদগ্ন্য কুণ্ড আছে, তার পার্শ্বে এক গিরিগুহায় মুনি জামদগ্ন্য তপোরত ছিলেন। সেখানে প্রেমদাসবাবা কিছুকাল নির্জনে তপশ্চর্যায় ছিলেন। এর পর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহ-কুমার অন্তর্গত পাঁচথুপী গ্রামে বিল্বমূলে, সন্ন্যাসীতলায়, শিবস্থানে তিনি কয়েক-বৎসর আরাধনায় রত ছিলেন। সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে দেবাদিষ্ট

হ'য়ে কয়েকবার তারাপীঠ শ্মশানে বিভিন্ন তিথি আশ্রয় ক'রে দিবারাত্র অবস্থা-ভেদে শ্মশানবাসিনী মাতার সাধনে তিনি কিছুকাল যুক্ত থাকেন। তারাপীঠের শ্রীতারাপদ পাণ্ডা প্রেমদাসজীর উত্তর সাধক ছিলেন। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার তিনি কাশীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে উদয়াস্ত স্বকর্মে রত ছিলেন। মধ্যাহ্নে শৃঙ্গারের সময়ে মাত্র এক জলপাত্র পূর্ণ দুগ্ধস্নাত বিশ্বনাথের চরণামৃত পান ক'রে মন্দিরের দ্বিতলে প্রসাদান্ন প্রাপ্ত হ'য়ে তিনি ধর্মাচরণে নিযুক্ত থাকতেন। কিছুকালের জন্য কাশীর অসিসংগমে জগন্নাথ মন্দিরে, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালের জন্য শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে উদয়াস্ত আত্মকর্মে আসীন থেকে, কিছুকালের জন্য কামাখ্যায় একদ্বার যুক্ত কুটিরে রুদ্ধদ্বারে কঠোর সাধনায় রত থেকে আনন্দ-লোকের অমৃতস্বাদ আস্বাদনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। কিয়ৎকাল পরে সেখান থেকে অভয়ানন্দ বাবার আশ্রমে এক গৃহে তিনি সাধনায় যুক্ত ছিলেন সে স্থানে অষ্টপ্রহরের মধ্যে প্রতিপ্রহর অন্তর চক্রাবর্তে, কখনো বা ততোধিক কাল একাসনে সুসংযত আহারে রুদ্ধদ্বারে তপশ্চারণে তিনি রত ছিলেন। সেসময় মাসে কেবলমাত্র অমাবস্যার একদিন তাঁর কর্মবিরতি ঘটত। বৃন্দাবন, গয়া, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে পূর্বোক্ত তীর্থক্ষেত্রের ন্যায় তিনি মধ্যে মধ্যে স্থানোপযোগী তপশ্চর্যায় নিযুক্ত থাকতেন। তীর্থ বক্রেশ্বরে স্থায়ীভাবে থাকার আঠারো বৎসর পূর্বেই এক্ষেত্রেও মধ্যে মধ্যে এসে তিনি দেবসাধনায় যুক্ত থাকতেন। এই সময় ধামের পরিত্যক্ত শিবমন্দিরে এবং একবার কয়েক মাস স্বর্গীয় গৌরদাস বাবাজীর শূন্য কুটিরে তিনি কর্মরত ছিলেন। উপরিউক্ত কালে মধ্যনিশায় শ্বেতগঙ্গার জলসমাধি সাধনে তিনি রত ছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি হিমালয়ে চারধাম,—যমুনোত্রি (যমুনার উৎপত্তি-স্থান), গঙ্গোত্রি (গঙ্গার উৎপত্তিস্থান), অনাদিলিঙ্গ শিব কেদারনাথ এবং বদরিনারায়ণ দর্শন করেন। পথিমধ্যে তুঙ্গনাথ, ত্রিযুগী নারায়ণ প্রভৃতি অপর তীর্থও তিনি দর্শন করেন। ঐ সময় ভারতের চারধাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তীর্থ—উত্তরভাগে বদরিনারায়ণ, দক্ষিণকূলে রামেশ্বর মহাদেব, পূর্বতীরে শ্রীক্ষেত্র এবং পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারকাধীশ তিনি দর্শন করেন। অতিভ্রমণে অবসাদ আসায় একক্ষেত্রে অবসর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ভগবৎসমীপে প্রার্থনা জানালে তিনি বক্রেশ্বর তীর্থে থাকবার আদেশ পান।

ফলে, এ কথা প্রান্তিক হবে না যদি বলা হয়, এই গ্রন্থ সাহিত্যগ্রন্থ না হ'লেও এই গ্রন্থটিকে অবলম্বন ক'রেই কোনকালে হয়ত সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে। এ গ্রন্থকে ইতিহাস বলা যাবে না বটে কিন্তু এইখান থেকেই হয়ত

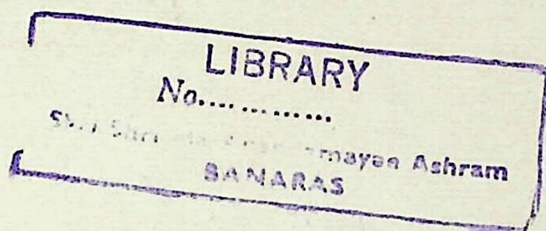
ইতিহাসের লুপ্ত ধারার সন্ধান মিলবে। লুপ্তপ্রায় তীর্থ বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য লোক-সমাজে অবগতির জন্য এবং এই গ্রন্থে বর্ণিত সপ্তমনীষীর জীবনআখ্যান সং-পিপাসু জনমধ্যে প্রচার হওয়ার জন্যই এই গ্রন্থের রচনা। আধ্যাত্মিক-অভিপ্রায়-নির্নীত পথেই এই গ্রন্থের আদ্যন্ত লিখিত এবং পুণ্যকাম ও পুণ্যাভিলাষীর পক্ষে এই গ্রন্থের রসাস্বাদন যে ব্যাখ্যা বা ভূমিকা নিরপেক্ষ—প্রকাশকের দিক থেকে তা একান্ত ভরসা বা বিশ্বাস।

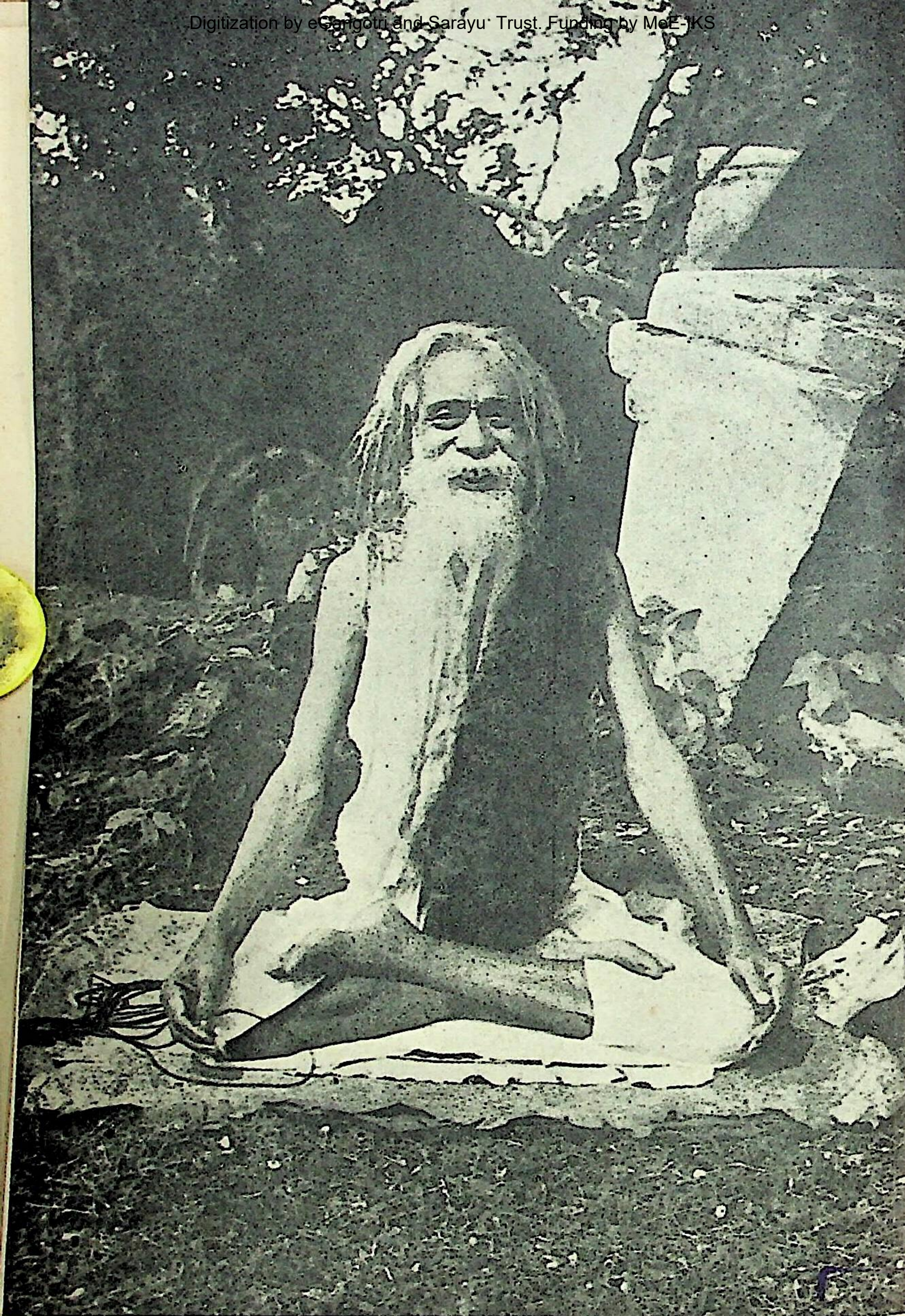
*   *   *

এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা আমার পক্ষে একান্তভাবে স্মরণ্য তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন সাধক ভক্তদা। তাঁরই কৃপায় আমি প্রেমদাস বাবাজীর সঙ্গে পরিচিত এবং এই পুণ্যকর্ম করবার অধিকার পেয়েছি। কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব 'জিজ্ঞাসা'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। গ্রন্থসজ্জা সম্পর্কে চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালের মূল্যবান উপদেশ স্মরণীয় ত বটেই, তাছাড়া আত্মীয়সদৃশ শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় ও অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রঞ্জিত সিংহ-এর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এ গ্রন্থ প্রকাশ আমার একার পক্ষে অসম্ভব হ'ত। এঁদের তিন জনের কাছে ঋণ স্বীকার না করলে আমার দিক থেকে অনেক কথা বলাই হয়ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সর্বোপরি ক্যালকাটা জব প্রেসের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দাস এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যাপারে সহায়তা ক'রে আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রচ্ছদপটশিল্পী শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ্য।

মহালয়া, ১৯শে আশ্বিন,
১৩৭১।

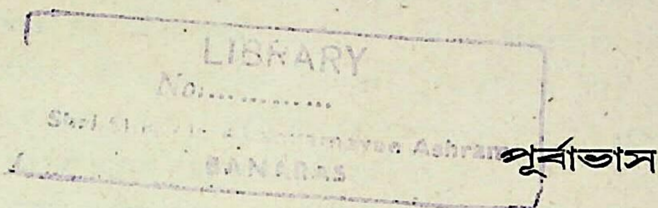
প্রকাশক


LIBRARY
No..............
mayee Ashram
BANARAS



প্রেমদাস তীর্থংকর

(গুহাবাসী)



পূর্বাভাস

গৌড়দেশে উচ্চরাঢ়খণ্ডে বক্রেশ্বর এক প্রাচীন তীর্থ। গুপ্তকাশী নামে তাহা খ্যাত। স্থূলদৃষ্টিতে এই স্থানের মহিমা লক্ষিত হয় না। কঠোর যোগযুক্ত সাধক ব্যতীত এই স্থানের নিগূঢ় গুণাগুণ কেহ বাহ্যত অনুভব করিতে পারিবেন না। উষ্ণ প্রস্রবণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই তীর্থক্ষেত্রের বাহ্য-আকর্ষণ দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও কর্মযোগী সাধকেরা এই ভূমিতে অতি উন্নত অবস্থা এবং অলৌকিক শক্তি লাভ করেন।

মহামুনি অষ্টাবক্র পঞ্চতপঃ যজ্ঞ করিয়া যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিলাষের একাংশ পূর্ণ হইয়াছিল। এযুগে তদ্রূপ তাপদগ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। এই পুণ্যক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে বসিয়া তপোরত হইলে পঞ্চতপঃ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা, দৈবসম্পদ বা ইন্দ্রতুল্য পার্থিব ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া সহজসাধ্য হয়। যাঁহারা মহাজ্ঞানী বা মহাযোগী, এ-ভূমির গভীর মাধুর্য শুধুমাত্র তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যিনি সূক্ষ্মে যুক্ত, এ স্থানের সূক্ষ্মানুভূতি তিনি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই তপোপ্রধান ভূমিতে উচ্চাশা পূর্ণ হয়। যাহা ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ, সাধনার দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে। যেইরূপ কর্ম, তদ্রূপ ফললাভ এই ভূখণ্ডে সম্ভব হইবে। সর্বোচ্চ আশা অর্থাৎ সেই দৈবকৃপা পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে, এই তীর্থে অনাসক্তভাবে সাধনা অভিপ্রেত। অন্যথায় সেই ঈপ্সিত ফললাভ সম্ভব নহে। উচ্চাঙ্গের সাধনায় বহিরঙ্গের সম্বন্ধ থাকিলে সরলগতি আড়ষ্ট হয়।

যে-সকল মহাপুরুষ এই বক্রেশ্বর তীর্থে দীর্ঘকাল পূর্বে বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকপরম্পরায় জ্ঞাত বহু ঘটনা আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সেই সৎপুরুষগণের স্মরণে ও সুধীজনের প্রেরণায় মনোলোকে যে সকল সত্য-তথ্য-বাক্য উদিত হইয়াছে, সত্যাশ্রয়ী হইয়া আমি সে-সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছি। যে সব ঘটনা বহুজনের অজ্ঞাত এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা লোকসমাজে অপ্রকাশিত, তাহাই এইরূপে জ্ঞাত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া সরলভাবে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

দ্বন্দ্ববিরোধের অতীত হইয়া, কল্পনার আশ্রয় না লইয়া, বিগতকালের বিবিধ ঘটনা এবং মহাজনগণের জীবন-আখ্যান—কোনো কোনো স্থানে লিখিত হইয়াছে।

যাঁহাকে স্মরণ করিয়া সত্য জ্ঞানের উন্মেষ করিতে স্থিরযোগে যুক্ত করিয়া যাহা জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই জীবন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে লিখিত হইল। ইহাতে অবিশ্বাস বা প্রতিবাদের কথা আসে না, কেবলমাত্র সরল বিশ্বাসে, সাধনালব্ধ সত্যাশ্রয়ে প্রাপ্ত বিষয়াদি প্রকাশের প্রয়াস পাওয়া গেল। তবে কাহার-ও মনের কোনো সরল বিশ্বাস বা কোনোরূপ কিংবদন্তীকে আঘাত করিবার ইচ্ছায় কিছু লিখিত হয় নাই। ফলত এই কর্মে অগ্রসর হওয়ায় আমার সঙ্কোচ স্বাভাবিক। সুতরাং যদি কোনো প্রসঙ্গে কাহারো কোনো মতবিরোধ থাকে তবে তাঁহাদের নিকট অকপট হৃদয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাহিতে প্রস্তুত আছি।

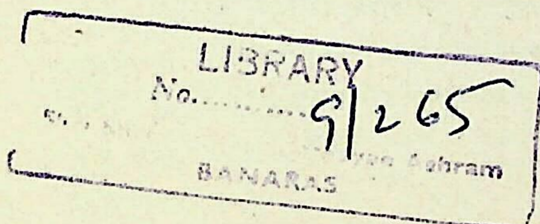
যুগযুগান্ত ধরিয়া কালের আবর্তে যে-ঘটনাদি মনুষ্যসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। অতীতের গর্ভে লীন হইবার জন্য বর্তমানের আবির্ভাব। যুগে যুগে এক এক দেহ ধারণ করিয়া যে-সব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সেইসব মহান ও বিরাট শক্তির মাধ্যমে সৎসমাজে ও জগৎ সম্মুখে বিবৃত ঘটনাদি এইখানে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয় সত্যবস্তু, এই বক্রেশ্বর তীর্থভূমিকে আশ্রয় করিয়াই সেই সব মহামানব ধীরস্থির আসনে থাকিয়া মহাযোগ ধ্যানে সে-কর্মসিদ্ধ করিয়াছেন। সৎপুরুষগণ চিন্ময়ধামের অলৌকিক লোকশক্তির প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

স্বেচ্ছাকৃত স্বেচ্ছাচারে যাঁহাদের জীবনপাত ঘটে নাই, তাঁহাদের-ই দ্বারা এ-ভূমি শুধুমাত্র দেবলোকের উপার্জিত, দৈবসম্পদগুণে বিভূষিত। মহামানব মহাযোগী কঠোর তপস্বিগণ চরম পরিপক্ব অবস্থায়, কিঞ্চিৎমাত্র কৃপালব্ধ পুরুষ হইয়া, পরমারাধ্য পরমপুরুষের পরিচয় নিজ নিজ চরিত্রের বিভিন্ন আচরণে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বর্তমান থাকিতে সেই যুগে তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভুনাথের বিভূতির অপরূপ শক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। কালের নিবিড় অতি ঘনাচ্ছন্ন ক্রোড়ে দিনে দিনে তাহা স্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। সেই মহামানবগণের সম্মিলিত প্রেরণাবাক্য কৃপাস্বরূপ এই অধমজনের উপর অর্পিত হওয়ায়, সেই উন্নত-উদার-মুক্ত পুরুষগণের শিক্ষা-চরিত্র-বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রকাশ করিবার শক্তি সে লাভ করিয়াছে।

দৈবকরুণায় সদাসিঞ্চিত অতীন্দ্রিয় সুধারসে মন আলোড়িত সেই সৎপুরুষেরা কোন্ দূর দূরান্ত হইতে আগত হইয়া, কাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, কাহার অতি প্রিয়জ্ঞানে এই বক্রেশ্বর মহাতীর্থে পালিত হইয়া, দেবলোকের দৈবভাবসম্পদ লোকসমাজে প্রকাশের যোগ্যতা লাভ করিয়া, সেই যুগকে তাঁহারা ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

আজ সেদিন গত হইয়াছে। অতীতকালের কুক্ষিগত সকল ঘটনা আচ্ছন্ন ও আবৃত হওয়ায়, মানব সমাজ হইতে তাহা বিলুপ্ত ও স্মৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছে। একমাত্র সুজনগণের প্রেরণাবাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, এতীর্থের অধিষ্ঠিত দেবতার কণামাত্র আশিস শিরে ধারণ করিয়া অধম হইয়াও আমি সৎ-প্রকাশে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছি।

পোঃ ও গ্রাম—বক্রেশ্বর,
জিঃ—বীরভূম। গ্রন্থকার



প্রথম স্তবক

বক্রনাথ বন্দনা

জয় সিদ্ধেশ্বর তপ্তেশ্বর মুক্তেশ্বর বক্রেশ্বর হে !
জয় মুনিবর অষ্টাবক্র পূজিত বক্রনাথ হে !
জয় খণ্ড সতীদেহ 'মনঃপাত' মহিষমর্দিনী খ্যাত প্রাণনাথ হে !
ব্যাস আদি মুনিগণ আরাধিত মঙ্গল গাওয়ে ;
ব্রাহ্মকালে নৈঋতে ব্যাসকুণ্ডে স্নাত ধবলনাথ হে !
দেবলোকে সুরেশ্বর মর্তে বিশ্বেশ্বর ত্রিলোকনাথ হে !
পঞ্চমুখে পঞ্চানন নাম প্রচারে নারদ বীণা ঝঙ্কারে ;
যুগান্তে পতিত পাবন অবধূত নিত্যানন্দ কৃপালভিল প্রেমনাথ হে !
শ্মশানে হরি হরিবোল হরনাথ উচ্চারে !

শিবস্তুতি

জয় জয় শঙ্কর শিবশম্ভু !
জয় জয় মহাদেব হর হর ব্যোম !
　　জয় ভোলনাথ ভবনাথ ভৈরবনাথ হরনাথ হে !
জয় জয় শঙ্কর শিবশম্ভু !
জয় জয় মহাদেব হর হর ব্যোম !
　　জয় কালনাথ কুলনাথ মেঘনাথ ভুধনাথ হে !
জয় জয় শঙ্কর শিবশম্ভু !
জয় জয় মহাদেব হর হর ব্যোম !
　　জয় অনাদিনাথ অমৃতনাথ অমরনাথ আত্মনাথ হে !
জয় জয় শঙ্কর শিবশম্ভু !
জয় জয় মহাদেব হর হর ব্যোম !
　　জয় সুধানাথ স্বয়ম্ভূনাথ বিভূনাথ গুণনাথ হে !

জয় জয় শঙ্কর শিবশম্ভু !
জয় জয় মহাদেব হর হর ব্যোম !
জয় উমানাথ গৌরীনাথ রমানাথ সতীনাথ হে !
জয় জয় শঙ্কর শিবশম্ভু !
জয় জয় মহাদেব হর হর ব্যোম !
জয় প্রণবনাথ প্রণয়নাথ প্রমথনাথ প্রাণনাথ হে !

(২)

অগ্নিবরণে রুদ্রনাথ,
ত্রিনয়নে ধ্যাননাথ,
যোগাসনে প্রণবনাথ,
শ্মশানচারী প্রমথনাথ,
কৈলাসেতে অলকানাথ,
নীলকণ্ঠে গরলনাথ,
উদাসী বিরাগী ভোলানাথ,
মুক্তি গুরুরূপে শঙ্করনাথ,
মোহনাশীতে মায়ানাথ,
নাগিনী বেষ্টিত কালনাথ,
বিপদত্রাতা সঙ্কটনাথ,
কুণ্ডলীজটাশিরে জটানাথ,
লিঙ্গদেহে শিলানাথ,
পঞ্চমুখে অমৃতনাথ,
সত্যমঙ্গলরূপে শিবনাথ।

জগন্নাথ স্তুতি

জয় জগন্নাথ জগদীশ জগদ্বন্ধু জনার্দন !
জয় প্রভু পুরুষোত্তম মধুসূদন নারায়ণ !

নৃসিংহ স্তুতি

দীননাথ দীনবন্ধু দীনদয়াল দীনস্মরণ ভগবান।
অভয় আশিস শুভকর নৃসিংহদেব নারায়ণ ॥

ভগবতী স্তুতি

ওসে যোগমায়া বিশ্বমায়া মহামায়া মহাকালী।
ওসে সত্যবতী পরমসতী ভগবতী ভদ্রকালা॥

গোবিন্দ স্তুতি

১। জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
প্রেমময়ী রাধিকাসহ ব্রজের জীবন॥

২। মদন মোহন গিরিধারী,
নটবর সাথে নব কিশোরী,
হৃদিশশী বৃন্দাবনচারী,
গোকুলধন রাসবিহারী,
বৈকুণ্ঠবাসী প্রেমহরি,
গোবিন্দ ভবভয়হারী,
মধুকৈটভারি দর্পহারী,
যমুনাতটে গোপীমনহারী
রাসপূর্ণিমা মধুকুঞ্জচারী
কেলিকদম্ব মূলে ত্রিভঙ্গমুরারি,
প্রিয়মিলন বাসে রাসেশ্বরী,
বেণু কি সুরে ডাকে, রাধাপিয়ারী,
নূপুর হয়েছে রাধানামধারী,
রুনু রুনু চরণে রাধানামকারী।

৩। বেণীপরে শিখিশোভন,
বামেতে গ্রীবার হেলন,
মধুর বঙ্কিম নয়ন,
নাসাতিলফুল শোভন,
অধরে বংশীবাদন,
ঘনশ্যাম দেহবরণ,
অঙ্গে লিপ্ত স্নিগ্ধ চন্দন,
কটিতে কনক বন্ধন,

চরণে নূপুর নিক্কণ,
নখেতে চন্দ্র শোভন,
শ্রীপদ্ম কমল বরণ,
হৃদিপরে হৃদিরঞ্জন।

৪। কালিয়া দমন,
শ্রীমধুসূদন,
মালার শোভন,
চন্দন লেপন,
তুলসী পূজন,
অধর কম্পন,
ব্রজেন্দ্র নন্দন।
জীবের জীবন,
বন্ধন মোচন,
অপরূপধন,
মায়ার খণ্ডন,
বিশ্ববিমোহন,
বৈকুণ্ঠে ভ্রমণ,
গুপ্তব্রজধন।
কুঞ্জে বিচরণ,
রসের স্ফুরণ,
জ্ঞানের বর্ধন,
ভক্তি প্রস্রবণ,
ভক্ত প্রাণধন,
লক্ষ্মী নারায়ণ।

৫। নয়ন রঞ্জন,
নয়ন মোহন,
নয়ন মদন।
বঙ্কিম নয়ন,
প্রেমিক নয়ন,

করুণ নয়ন।
নয়ন মিলন
নয়ন নর্ত্তন,
নয়ন বন্ধন।
চপল নয়ন,
আকর্ষ নয়ন,
চতুর নয়ন।

৬। বন্দে মহাপুরুষোত্তম নারায়ণম্!
কম্বুকণ্ঠং সুললিত বদনম্
সুচারু চিক্কণং মনোরমম্,
সুহাসিতং ত্রিভঙ্গ বক্রম,
চন্দনচর্চিতং বনকুসুম শোভিতম্,
স্থিরবিদ্যুৎ শোভা পীতাম্বর পরিহিতম্,
কাঞ্চন নূপুর চরণ ভূষণম্,
কুসুমালঙ্কার অঙ্গাভরণম
চম্পক অঙ্গুলি নখ শশিকলা বিনিন্দিতম্,
অর্ধনিমীলিত বঙ্কিম নয়নম্,
সুগন্ধী বিলেপং কুঞ্চিত কেশম্,
অঙ্গে ভঙ্গে চিত্তাকর্ষম্,
রত্ন কিরীট শিখি শোভিতম্,
নীলোৎপল বর্ণং অধরামৃতক্ষরণম্,
কমলদল কোমল ওষ্ঠদ্বয়ম্,
মঙ্গলং মধুরং প্রিয়ং সুখদম্
পদযুগ কমলাহৃদি আসনম্,
রঞ্জক রঞ্জিত শ্রীপদযুগলম্,
অধরচুম্বিত করধৃত বেনুবাদনম্,
প্রেমরূপং প্রেমময়ং প্রেমিকম্,
চতুরং রসিকং গুণাতীতম্,
নবকিশোরং নিত্যনব ভাবোদ্রকম্,
দিব্যজ্ঞানোজ্জ্বলং দীননাথম্,

সৎপ্রকাশং সত্যস্থিতম্ সুন্দরম্,
নিত্যানন্দং কালরূপং ব্রহ্মময়ম্,
গোবিন্দং কেশবং গোপীনাথম্,
রাধাবল্লভং মদনমোহনম্,
নমস্তে শ্যামসুন্দরং নারায়ণম্।

৭। দরিদ্রানাং দীনানাং আর্তানাং বলং নারায়ণ!
অনাথস্য নাথঃ ভয়ার্তস্য আশ্রয়ঃ অভুক্তস্য রসদাতা
অজ্ঞানস্য গুরুঃ নারায়ণ!
প্রেমিকস্য প্রিয়ঃ অরূপস্য অপরূপঃ অভক্তস্য ভীষণঃ
ভক্তস্য মধুরঃ নারায়ণ!
বিশ্বাসহীনস্য দূর দর্পান্ধস্য ব্রজঃ শক্তিহীনস্য কৃপাময়ঃ
অপরাধিজনস্য পাপমুক্তঃ নারায়ণ!

৮। তুমি পরমানন্দ প্রেমানন্দ!
তুমি জীবনানন্দ জিতানন্দ!
তুমি অখণ্ডানন্দ সত্যানন্দ!
তুমি নিখিলানন্দ দীনানন্দ!
তুমি সৌরভানন্দ শুদ্ধানন্দ!
তুমি সচ্চিদানন্দ ভূমানন্দ!
তুমি মহানন্দের মহানন্দ!

৯। ব্রহ্মানন্দ বিশ্বানন্দ,
অভয়ানন্দ অচলানন্দ,
নিগমানন্দ নিরঞ্জনানন্দ,
আগমানন্দ আশানন্দ,
প্রাণানন্দ প্রসাদানন্দ,
ভজনানন্দ ভক্তানন্দ,
নূপুরানন্দ নীরদানন্দ,
চতুরানন্দ চিদানন্দ,
চেতনানন্দ চপলানন্দ,

ভূষণানন্দ ভাবানন্দ,
কেশবানন্দ কুলদানন্দ,
রসিকানন্দ রাধানন্দ,
রমণানন্দ রসানন্দ,
অমৃতানন্দ অমরানন্দ,
আবেশানন্দ আকুলানন্দ,
স্বরূপানন্দ সৃজনানন্দ,
বিকাশানন্দ বিজনানন্দ,
গোপনানন্দ গৌরবানন্দ,
দয়িতানন্দ দয়ানন্দ,
করুণানন্দ কল্যাণানন্দ,
প্রমোদানন্দ প্রণতানন্দ,
মোহনানন্দ মায়ানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।

১০। নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দ,
শুভানন্দ সদানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
সমানন্দ শিবানন্দ,
জ্ঞানানন্দ গুণানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
কৃষ্ণানন্দ কৌতুকানন্দ,
রাধানন্দ রূপানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
নবীনানন্দ নয়নানন্দ,
মধুরানন্দ মথুরানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
বৃন্দানন্দ ব্রজানন্দ,
গোকুলানন্দ গোপিকানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
অসীমানন্দ অতুলানন্দ,

শ্যামানন্দ শ্যামলানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
কমলানন্দ কুসুমানন্দ,
বিশ্বানন্দ বিমলানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
প্রিয়ানন্দ প্রেমানন্দ,
পূর্ণানন্দ প্রেরণানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।
বিপুলানন্দ বিভবানন্দ,
মদনানন্দ মোহনানন্দ,
তুমি ! মহানন্দের মহানন্দ।

ব্রহ্ম স্তুতি

সোঽহং শিবোঽহং ব্রহ্মময়ম্ ।
অমৃতং আত্মানন্দং পরমসুখদম্ ॥

তীর্থ বক্রেশ্বর

দক্ষযজ্ঞক্ষেত্রে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব সেই দেহ স্কন্ধে লইয়া আত্মহারা অবস্থায় বিচরণ করিতেছিলেন। এক মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, বিষ্ণু সেই পবিত্র সতীঅঙ্গ নিজচক্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিলেন। সতীদেহ স্পর্শে যতক্ষণ শিব ছিলেন, তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। একে একে সেই সর্বপূত দেহ খণ্ডিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইলে পর, দেবাদিদেব বিশ্বনাথের চৈতন্যোদয় হয়। এই পবিত্র খণ্ডিত দেহ যে-সকল স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সব ক্ষেত্র এক একটি পীঠস্থান বা পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এক পঞ্চাশৎ সতীদেহখণ্ডে একপঞ্চাশৎ পীঠস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধকগণ কেহ ঐ তীর্থগুলি দর্শন করিয়া কেহ ঐ স্থান আশ্রয় করিয়া তথায় তপস্যারত হইয়া আছেন।

বীরভূম জেলায় সতীর পাঁচটি ছিন্ন অঙ্গের পতনে তাহা পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

১। সাঁইথিয়া রেলস্টেশনের পূর্বভাগে নন্দেশ্বরী রহিয়াছেন। এই স্থানে দেবীর কণ্ঠের হার পতিত হইয়াছিল। এই তীর্থে দেবী হইলেন নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর।

২। নলহাটি স্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে নলাটেশ্বরী দেবী রহিয়াছেন। এক্ষেত্রে মাতার কণ্ঠনালী পতিত হইয়াছিল। এ স্থানে দেবী হইলেন কালিকা এবং ভৈরব যোগেশ।

৩। কাঞ্চিদেশ কঙ্কালিতলা বলিয়া পরিচিত। বোলপুর স্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে এবং কোপাই নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। এস্থানে একটি কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে একখণ্ড শিলা রহিয়াছে। সেই শিলাকে সর্বসাধারণে পূজা করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে দেবী হইলেন দেবগর্ভা এবং ভৈরব রুরু।

৪। কাটোয়া লাইনের লাভপুর স্টেশনের অদূরে অবস্থিত আমোদপুর এবং কোপাই নদীর সন্নিকটে ফুল্লরাতলা। এই স্থানে মাতার অধঃওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। প্রকাণ্ড এক শিলাখণ্ডের মন্দিরের মধ্যে প্রায় দশ বার হাত স্থান বিস্তৃত দেবীর অধঃওষ্ঠাকৃতি। ঐ ওষ্ঠাকৃতি ঊর্ধ্বেও প্রায় সাতআট হাত

প্রসারিত। এই তীর্থে শিবাভোগ অতি আশ্চর্য দৃশ্য। এ ক্ষেত্রে দেবী হইতেছেন ফুল্লরা এবং মন্দির পার্শ্বে ভৈরব বিশ্বেশ্বর মন্দির স্থিত।

৫। সিউড়ি হইতে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিম-দক্ষিণে এবং তুবরাজপুর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বক্রেশ্বর তীর্থ অবস্থিত। এই তীর্থে ভৈরব বক্রনাথ এবং দেবী মহিষমর্দিনী দুর্গা।

বক্রেশ্বরদেবের মূল মন্দির মধ্যভাগে স্থাপিত। বহিরাঙ্গন হইতে এই মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমমুখে প্রবেশ করিলে আচ্ছাদিত প্রথম বৃহৎ খিলান হইতেছে নাটশালা। তাহার পর কিছু অগ্রসর হইয়া নিম্নে পশ্চিমভাগে কয়েকটি সোপান সম্মুখে মন্দিরের মধ্যভাগে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মন্দির মধ্যে দুইটি শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। পিতল ধাতু নির্মিত আচ্ছাদনে অষ্টাবক্রমুনির প্রস্তর লিঙ্গ স্থাপিত আছে। তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছে ক্ষুদ্রাকার বক্রনাথের শিবলিঙ্গ।

অষ্টাবক্রমুনির কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া বক্রেশ্বরদেব তাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন, "তুমি এস্থানে শিবতুল্য হইয়া আমার পার্শ্বে উপাসিত হইবে।" সেই কারণে মন্দিরের মধ্যে পাশাপাশি দুইটি শিবলিঙ্গ আছে।

বক্রেশ্বরদেব ও তাহার পার্শ্বস্থিত কুণ্ডলাকার সর্পের মস্তকে অমৃত কুম্ভাধারে কুণ্ডাকারে অনন্ত জলরাশি বিরাজ করিতেছে। উপরিভাগে প্রস্রবিণীধারারূপে প্রকাশিত হইয়া তাহা ভূতলে বহিয়া যাইতেছে। অমৃতধারায় সদাস্নাত বক্রনাথের শিরোপরি পতিত বারিধারায় বহমান হইয়া, সপ্তধারায় বিভিন্ন গুণে তরঙ্গায়িত হইয়া, কখনো উপরে উত্থিত বুদ্‌বুদ্‌ আকারে আবার কোন স্থানে স্রোতোধারায় প্রকাশ হইতেছে। নিম্নে সর্পের মস্তকোপরি সুধাময় কুম্ভের লীলায়িত জলধারা দেবাদিদেব বক্রেশ্বরের শিরোপরি বর্ষণে, বেষ্টনাকারে, সপ্তধারা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতেছে।

সপ্তধারা তীরে এই তীর্থের মনীষিগণ সপ্ত তপস্বী ধ্যানস্থ হইয়া যোগেশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন। যোগমায়া, যোগেশ্বরীদেবী মহিষমর্দিনীরূপে এ স্থানে বক্রেশ্বরদেবের চরণ-অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া মধুময় সপ্তধারায় পরিধৌত করিতেছেন। যোগীবর সতীর সাধনা, যোগব্রতীর তপস্যা, ভক্তগণের কাতর আবেদনে তুষ্ট হইয়া সপ্ত প্রেমধারায় শুভাশিস সদাবিতরণ করিতেছেন। ত্রিগুণাতীত মহাদেবের মহিমা রূপে বাষ্পোত্থিত জলকণা চতুর্দিকে বিকিরণ করিয়া, সর্বৌষধিরূপে ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দেহমনপ্রাণ শীতল করিতেছে। একনিষ্ঠ ভক্ত নিজ ভক্তি ও বিশ্বাসের বিনিময়ে যথোপযোগী কৃপালাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতেছে। এইস্থানে বক্রেশ্বরদেব কূর্মাকারে গঠিত ভূখণ্ড পৃষ্ঠোপরি বিরাজ করিতেছেন।

চতুষ্পার্শ্বে বক্রেশ্বরদেবকে কুণ্ডগুলি প্রণবাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। উত্তরে

ব্রহ্মকুণ্ড শ্বেতগঙ্গা হইতে পূর্বে দক্ষিণভাগে সূর্যকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড বা সৌভাগ্যকুণ্ড তথা হইতে জীবৎস কুণ্ড, পুনরায় ঘুরিয়া ক্ষারকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড হইয়া প্রণবাকার গঠিত হইয়াছে।

বক্রেশ্বর তীর্থভূমিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্বেতগঙ্গার উচ্চাংশ উত্তর ও দক্ষিণভাগ। পশ্চিমে শ্বেতগঙ্গা জল-নিষ্কাষণ-পয়ঃপ্রণালী শিমুল বৃক্ষ পর্যন্ত, দক্ষিণে কুণ্ডগুলির উত্তর ভাগ, পূর্ব দিকে ভৈরব ও নৃসিংহ কুণ্ডের প্রান্তভাগ পর্যন্ত এই অংশ সত্ত্বগুণপ্রধান।

দেবী মহিষমর্দিনী মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের নিম্নে পাপহারা নদীর উত্তর ভাগ দিয়া পশ্চিম প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত এবং শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমভাগ হইতে বটবৃক্ষ পর্যন্ত এই ভূমি রজোগুণপ্রধান।

পাপহারা নদীর সর্ব পশ্চিম তীর হইতে দক্ষিণ শ্মশানভূমি ও তৎপূর্বে ধান্যক্ষেত্রের উপরিভাগ স্থানগুলি তমোগুণপ্রধান।

যিনি যেরূপ সাধক, তাহার আসন তিনি সেই স্থানে লইয়া থাকেন। তবে সাধকের কর্মের তারতম্য অনুসারে কোন স্থানই নিম্ন নহে; এই তীর্থের সকল ক্ষেত্রই সাধনের অনুকূল। সত্ত্ব ও রজোগুণের সংমিশ্রণে তমোগুণ থাকিলেও সাধকের কর্ম তদনুরূপ হয়।

বক্রেশ্বর ক্ষেত্র সাধারণভাবে ও ভাষায় ত্রিগুণে বিভক্ত হইলেও এ স্থান ত্রিগুণাতীত চিন্ময়ধাম। এ ক্ষেত্রে খণ্ডিত গুণের ব্যবধান নাই। তাহার কারণ যাহার রজের প্রতিকণায় উচ্চগুণের সমষ্টি রহিয়াছে, যে-কোন-স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তি একধ্যানে তপস্যারত হইলে তথায় কৃপা বা সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। সে-ক্ষেত্র সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিবার কিছু নাই। তবে স্থূল ও লৌকিক ভাবে ইহা বিভিন্ন গুণে খণ্ডিত করিয়া প্রদর্শিত হইলেও, উচ্চাধারে গুণাতীত অবস্থায় তাহার প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এবং পরিণামে অখণ্ড অপ্রাকৃত আনন্দে লীন হইয়া পারমার্থিক অবস্থার অনুভূতি দান করে।

দান পাইবার যোগ্যতা লাভ করিলে, দাতার মুক্ত হস্ত প্রসারিত হইবেই—ইহাই এই স্থানের প্রকৃত গুণের পরিচয়। এই ক্ষেত্রে রূপের প্রকাশ উচ্চাধারে স্থিত এবং তদ্দ্বারা সাধনকর্মে-আচরণে সর্ব সমক্ষে তাহা কালে পরিপক্ক অবস্থায় উদ্ঘাটিত হয়। সেই মুক্ত অতীত আনন্দঘন মূর্তির কৃপালাভে পুষ্ট সাধক নিজ সাধনে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার পরিণাম ও পরিচয় চিৎশক্তির প্রকাশ। সঞ্চিতস্থিত সৎআধারে চিন্ময়ের বিভূতি গোচরীভূত।

এ ক্ষেত্রের যিনি অধিদেবতা, তিনি স্বয়ং যোগীশ্বর স্বয়ম্ভূনাথ বক্রেশ্বরদেব

মহাদেব। সেই যোগীবরের ধ্যানে তপস্যারত তপস্বী ত্রিগুণাতীত অবস্থায় ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ হন। অতঃপর এই চিন্ময়ধামে সৎ সংস্পর্শে ও মিলনে, নির্গুণ সগুণের ভেদবিদ্ধ করিয়া তিনি গুণাতীত অখণ্ড অব্যক্ত অব্যয় অবস্থা প্রকাশ করেন।

সর্বজ্ঞান ও গুণের আধার, তাঁহাকে কোনো সীমায় বদ্ধ করিয়া কি প্রকাশ করিতে পারা যায়? সর্বকালে যিনি মহাকাল, সর্বযুগে যিনি অসীম গুণাতীত, যিনি সর্বাবস্থায় অব্যক্ত আনন্দের সমষ্টি হইয়া ভাবাতীত অবস্থায় একমাত্র উন্নত আধারে প্রশান্ত হইয়া স্থিত, সেই যোগীশ্বর ধ্যানস্থ অবস্থায় স্তিমিত নয়নে শিবনেত্রে নিত্য এই চিন্ময় ধামে স্বপ্রকাশ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

কেবল অনুভূতি লাভে যাঁহাকে চিদানন্দ একমাত্র অবিরাম অমৃত স্নিগ্ধধারায় পরিধৌত ও স্নাত করিতেছেন, তাঁহারই অনন্য স্মরণে অনির্বচনীয় চিৎ-ঘন-মূর্তির প্রকাশ করিতে পারা যায়। সাধনে কত কাল গত হইল, কত যুগ কিরূপে অতীত হইল, কত পল বিপল অনুপল, কত ক্ষণ অনুক্ষণ বর্তমান হইতে অতীত গহ্বরে নিমজ্জিত হইল তাহার নির্ণয়ের অবকাশ নাই। একমাত্র এক যোগেই যোগীন্দ্র করুণায় পরমার্থলাভে পরমপুরুষের যোগ্য পরিচয় দানে কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চিত করিতে পারেন।

সাধনযুক্ত যে-পুরুষ তপস্যারত হইয়াছেন, কর্মপ্রভাবে মহাকালের স্মরণে তৎকৃপালব্ধ অবস্থায় পরিণত হইলে কালে কোন্ শক্তির পরিচয় বা প্রকাশ করিল—একথা কাহার সাধ্য বিচার করে? যিনি এই চিন্ময়ধামে বাস করেন এবং হৃদয়ে বক্রেশ্বর মহাদেবের আবাসভূমি সৃজন করিয়া, শান্ত হইয়া প্রশান্তের ধ্যানে নিমগ্ন, তিনি-ই অবিরত পবিত্রধারায় পরিমার্জিত কৃপালব্ধ পুরুষ। সেই পরম পিতা পরমপুরুষ পরমদয়াল বক্রেশ্বর দেবের একমাত্র করুণালব্ধ মানব সমস্ত সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

নিত্যকাল আসিতেছে ও যাইতেছে, ভবিষ্যতের কোন্ ঘনান্ধকার হইতে আসিয়া, বর্তমানে স্বল্প কাল প্রকাশিত হইয়া পুনরায় কোন্ তমসাচ্ছন্ন অতীতে লীন হইতেছে, কে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া স্মৃতিপটে চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে? এই মহাকালের গহ্বর হইতে কত অভিনব উজ্জ্বল প্রকৃতি-পুরুষ প্রকাশমান হইয়া পুনরায় তাহাতে নিবৃত্তি হইতেছে। কাল বা দিক নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই, তপস্বী একমাত্র কালাতীতের অনন্য স্মরণে—এ ক্ষেত্রে মহামৃত্যুঞ্জয়ের চিরপ্রসাদ লাভ করিবার সামর্থ অর্জন করিয়া জীবন ধন্য করিয়া, অক্ষুণ্ণ প্রেমভক্তিসংযোগে সীমা হইতে অসীমের আস্বাদ পাইবার যোগ্যতায় মুক্ত পুরুষ হইয়া এস্থানে বিরাজ করেন।

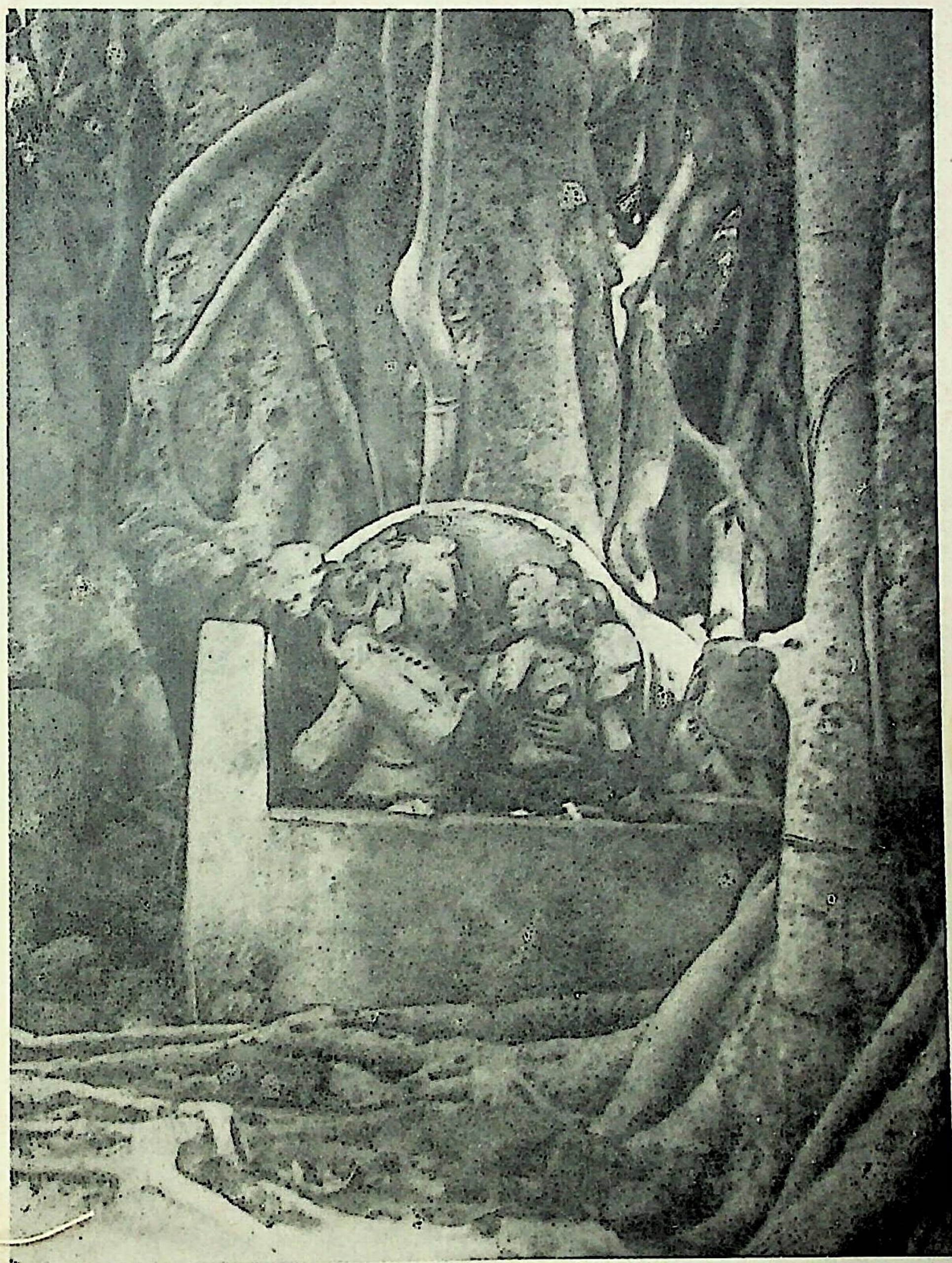
গুণবান ব্যক্তি সগুণের সাধনায় কোন্ অতীত যুগে মহামুনি মহাযোগী অষ্টাবক্র পরম তপস্বী কঠোর তপদ্বারা মর্তলোকে বক্রেশ্বর দেবমহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রের দেব-দেবী কালে কালে গুণিগণকে নিজ চরণাশ্রিত করিয়া তাঁহাদের জীবন নির্মল ও ধন্য করিয়া নিজ ভাবের বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তপস্বিগণের ভিন্ন আধারে বিভিন্ন জ্ঞানধারা এক এক রূপে সঞ্চার হইয়া তাঁহাদের গভীর অনুরাগের পুরস্কার ভক্ত অনুরাগী লোকসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

এস্থানে কৃপালব্ধ মনীষিগণ বিভিন্ন কালে দেবাদিদেব বক্রনাথ এবং আদ্যাশক্তি মহিষমর্দিনীর করুণালব্ধ হইয়া বিভিন্ন উন্নত কর্মদ্বারা জীবকল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রসাদলাভে আজও মধুময় অমৃত আস্বাদের জন্য দিক দিগন্ত দূর দূরান্ত হইতে সাধক-তপস্বী-যোগী-জ্ঞানী-গুণী-ভক্ত সমাগমে পূত ক্ষেত্রের সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। কেহ এই বিশুদ্ধ স্থানবাসে উন্নত, আবার কেহ আধারভেদে করুণাময়ের স্নেহসিক্ত এবং দয়াময়ী শত্রুদলনী শান্তিদায়িনী দেবী মহিষমর্দিনীর সুধারসসিঞ্চনে অপাপবিদ্ধ ও অজাতশত্রু বরলাভ করিয়া জীব জগতে বিরাজ করিয়া থাকেন।

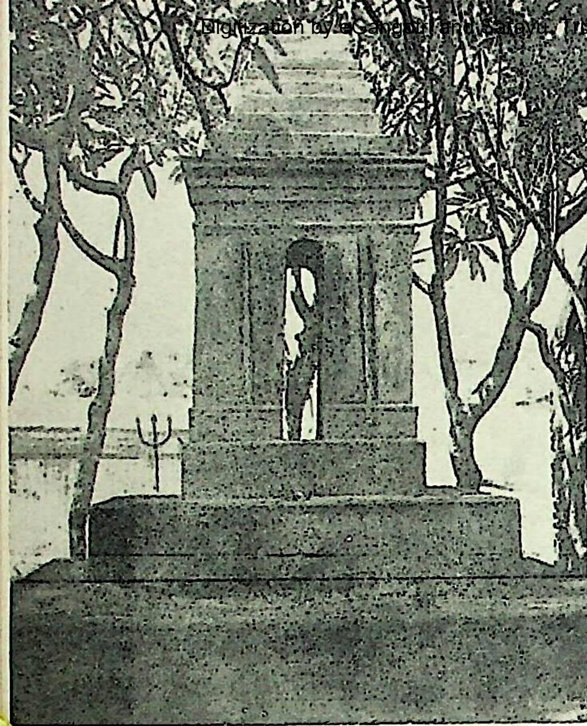
সেই পরম পবিত্র হইতে আগত, স্বর্গীয় সুষমায় স্নিগ্ধ সুধী ও ভক্তগণ এই বক্রেশ্বর তীর্থে কৈলাসধামের অনুপম অব্যক্ত অক্ষয় আনন্দ বর্ষনে স্নাত হইয়া স্বস্থানে সকলে বিরাজ করেন।

মূল মন্দিরের পশ্চিম ভাগে দেবী মহিষমর্দিনী মূর্তি অবস্থিত। এক বেদীর উপর ধাতু নির্মিত মূর্তি দশভুজা দুর্গার সহিত বিরাজ করিতেছেন—সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, অসুর; তাহা ছাড়া দেবীর হস্তে সর্প রহিয়াছে। মহাত্মা খাকিবাবা তাঁহার ভক্ত দ্বারা এই বেদী সংস্কার করাইয়াছিলেন। পূর্বে এই বেদী শূন্য ছিল। এরূপ শূন্য বেদী রাখিতে নাই, সেজন্য খাকি বাবা এই ধাতু মূর্তি স্থাপিত করেন। বেদীর উপরিভাগে এক শিলাখণ্ড রহিয়াছে। তাহার মধ্যভাগে ক্ষুদ্র গহ্বরে দেবীর ভ্রূ-মধ্যস্থান "মন" পতিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন প্রদর্শিত আছে।

এই মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল সঙ্কটমোচন বটুক ভৈরবের মন্দির। কয়েকটি সোপান নিম্নে অনাদিলিঙ্গ রূপে তিনি বর্তমান রহিয়াছেন। এতদঞ্চলের সঙ্কটমোচন রক্ষক ও পালক ভাবে তিনি মনুষ্যের বিবিধ বাসনা পূর্ণ করেন। আপদউদ্ধার বটুক-ভৈরব-স্তব ইঁহারই উদ্দেশ্যে পঠিত হয়। বাসনা পূর্ণ হইলে লোকে কেহ কেহ এস্থানে তাঁহার নিকট ছাগ বলি দেয়। অন্নপ্রাশনের সময়ে তাঁহার নিকট নবজাতক শিশুর কেশমুণ্ডন করানো হয়।

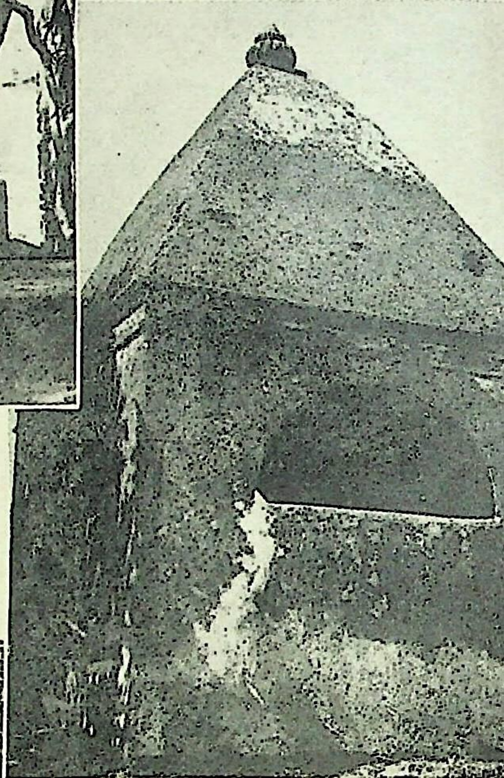


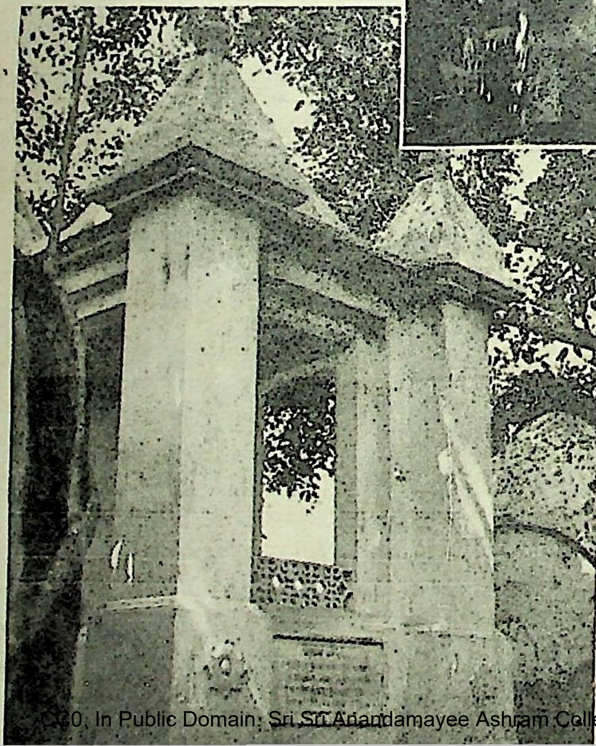
অক্ষয়বট মূলে শৃঙ্গার বেশে মাধব মূর্তি



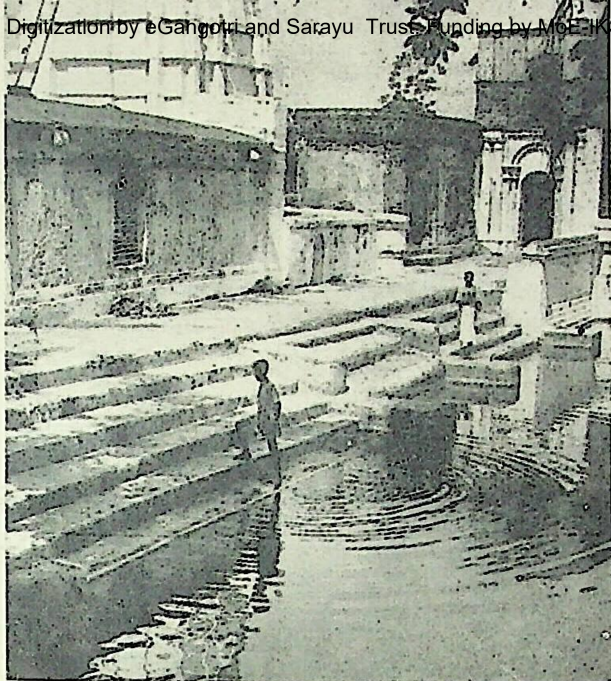
ব্যোমানন্দ সরস্বতীর সমাধি

খাকি বাবার সমাধি

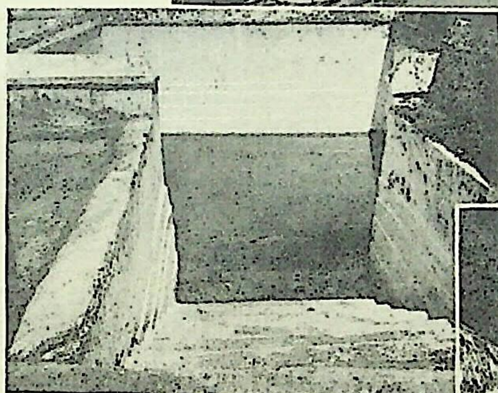




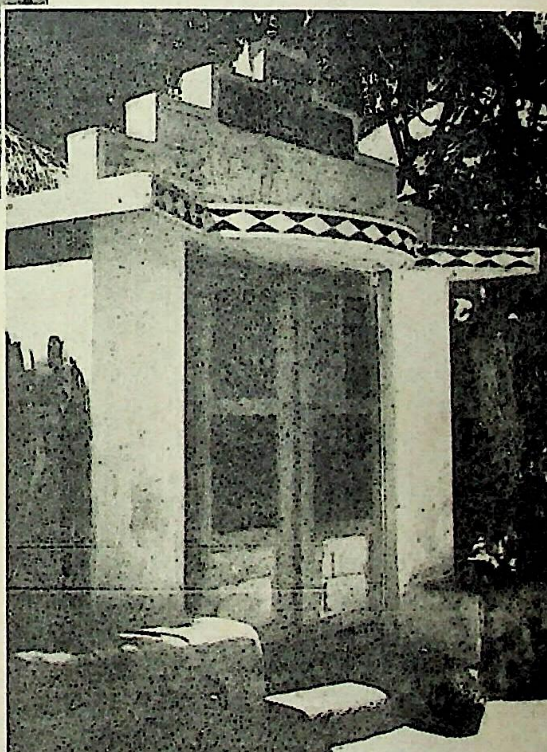
মন্দিরে অবস্থিত প্রভুপদ
নিত্যানন্দের চরণ চিহ্ন



শ্বেতগঙ্গা



অগ্নিকুণ্ড বা নৃসিংহ কুণ্ড



চক্রবর্তী বাবার সমাধি

পাপহারিণী নদী

জীবৎস কুণ্ড



বক্রেশ্বর নদী গ্রামের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর বাহিনী হইয়াছে। পুনরায় পূর্বমুখে বহিয়া দক্ষিণভাগে স্রোতস্বতী বহমান হইয়া যাইতেছে। নদীর এই স্রোতোধারা বক্রনাথকে সর্পাকারে বেষ্টন করিয়া আছে।

তুইশত বৎসর পূর্বে বক্রেশ্বরতীর্থের চতুষ্পার্শ্ব জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সেই কারণে বক্রনাথদেবের সন্ধ্যা ধূপ-প্রদীপ দিতে গ্রাম হইতে দেবালয়ে সেবায়েত-গণ তিন চারজন মিলিত হইয়া সেখানে যাইত। শালের খুঁটির প্রান্তভাগ প্রস্তর দ্বারা চূর্ণ করিয়া, মশাল আকারে তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইতেন।

সে সময় এ তীর্থে সাধুগণের বাস অতি অল্প ছিল। বন্যজন্তুর উপদ্রবের ভয়ে এই ভাবে আগুন জ্বালিয়া, সন্ধ্যা প্রদীপ-ধূপ দিয়া কাঁসর বাজাইয়া সেবায়েতগণ গ্রামে চলিয়া যাইতেন। এই কারণে সন্ধ্যাকালে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অপর কোন সেবার ব্যবস্থা এ দেউলে নাই। দিবাভাগে মধ্যাহ্নে একবার বক্রেশ্বরদেব বক্রনাথ, দেবী মহিষমর্দিনী ও বটুক ভৈরব এই তিন স্থানে পায়সান্ন ভোগ দিবার রীতি আছে। পূর্বাপর অংশ অনুপাতে সেবায়েতগণ তাঁহাদের সেবা পরিচালনা করিতেন। একই কালে পঞ্চলিঙ্গ শিবের উদ্দেশ্যে পায়সান্ন ভোগ নিবেদিত হইত।

প্রতিদিন নিজ অংশ অনুসারে যাঁহার যে-কয়েকদিন সেবা করিবার অধিকার, সেই সেবায়েত প্রথম মন্দিরের মধ্যভাগ মার্জন করেন। পরে বিল্বপত্র পুষ্প শ্বেতগঙ্গোদক এবং পরিধৌত আতবান্ন অর্ঘ ও নৈবেদ্য উপরিউক্ত তিন স্থানে অর্থাৎ বক্রনাথ, মহিষমর্দিনী ও বটুক ভৈরবস্থানে এবং পর্বতলিঙ্গ শিবস্থানে নিবেদিত হয়। মধ্যাহ্নে পাঁচসের দুগ্ধ, আধসের আতপ, আধসের গুড়ের পায়সান্ন তিনটি পৃথকস্থালীতে বক্রনাথ, দেবী মহিষমর্দিনী ও বটুক ভৈরব মন্দিরে ক্রমান্বয়ে সেবার জন্য সমর্পিত হয়। এই ভোগ শেষ হইলে দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়।

শারদীয় দুর্গাপূজার সময় চারিদিন দেবী মহিষমর্দিনীর সম্মুখে মন্দির মধ্যে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা হয়। নবমীর দিন ছাগ বলি এবং সেই রাত্রিকালে মাতার অন্ন ভোগ হয়।

সেবায়েতগণ এই উপলক্ষে সম্মিলিত হইয়া রাত্রিতে ভোগ রন্ধন ও বণ্টন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। এ সময়ে মায়ের অঙ্গনে তাঁহাদের সকলের আনন্দ মিলনের সুযোগ ঘটে। বিজয়ার পর দেবদেবীকে গ্রামের সকলে আসিয়া প্রণাম করিয়া যান।

বক্রনাথ মন্দিরের দক্ষিণভাগে সাধুগণের ধুনিঘর রহিয়াছে। ধুনি ঘরটি ১৬৭৭ শকাব্দে নির্মিত হয়। বক্রেশ্বর তীর্থের এক ক্রোশ

দক্ষিণে মেটেলা গ্রামের এক ভক্ত এই গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার পূর্বার্ধভাগে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীন ইষ্টকে গঠিত এবং উপরিভাগ খিলান করা রহিয়াছে। প্রাচীর গাত্রে কতগুলি পোড়ামাটি নির্মিত মূর্তি রহিয়াছে।

বক্রেশ্বর নদী বহুপূর্বে এত প্রশস্ত ছিল না। সেইজন্য পশ্চিম ভাগে বাঁধ দিয়া পাপহরার দিকে নদীর গতি ফিরাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সিউড়ির নিকট করিধ্যা গ্রামের রামলাল চট্টোপাধ্যায় অর্থের চুক্তিতে বক্রেশ্বর নদী বাঁধিবার ভার পাইয়াছিলেন। ঐ গ্রামের সেনপরিবার এই বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। নদীর বাঁধ সমাপ্ত করিবার পর সাহাপুরের জনৈক ধনী মুসলমানের নিকট হইতে এক বৃহৎ হস্তী আনাইয়া বাঁধের উপর তাহাকে চালাইয়া মাটি দৃঢ় করা হইয়াছিল। নদীর জল পাপহরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে তাহাতে পার্শ্বের জমির ক্ষতি হইতেছিল এবং বক্রেশ্বর গ্রাম অধিক বন্যার সময় জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া এবং দুইবার নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর কেহই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। ঐ সময় বালুকায় পূর্ণ হইয়া পাপহরার গভীরতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

কোন্ অতীত যুগে মধুর দেবলীলা বক্রেশ্বর তীর্থে প্রকট হইয়াছিল, যদ্দ্বারা এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাধক সাধনলব্ধ কৃপাশিস নতশিরে ধারণ করিয়াছিলেন। কঠোর সাধনপ্রাপ্ত সিদ্ধ অবস্থায় সেই মহাজনেরা পরমপুরুষের প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুরুষকারের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দেবাশ্রয়েও তাঁহাদের চরণ স্মরণ করিয়া লেখকের মনোমধ্যে যাহা উদিত হয়, প্রেরণালব্ধ সেই বিষয়গুলি অধিকক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ হইল। ইহাতে কোনো স্বকপোলকল্পিত ঘটনাবলীর সমাবেশ প্রকাশিত হয় নাই।

শকাব্দের প্রথমভাগে বক্রেশ্বর তীর্থে কপিলদেব নামে এক মহাযোগী তপোব্রতী হইয়াছিলেন। বক্রেশ্বর দেবের মন্দির ও তীর্থস্থান সংস্কার দ্বারা উন্নত হউক—এই বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরিত হয়। এই বিশাল গঠনকার্যের ব্যয়বাহুল্য বিবেচনা করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশ ও তীর্থ অতিক্রম করিয়া কপিলদেব মিথিলাদেশে উপস্থিত হন। তথায় রাজধানীর একপ্রান্তে ভক্তগণের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। সেই মহাপুরুষের অলৌকিক প্রভাব লোকমুখে তথাকার রাজা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলেন।

সেই দেশাধিপতির নাম চন্দ্রনারায়ণ। তিনি নিঃসন্তান। তাই তাঁহার

মনে শান্তি ছিল না। বহু যাগযজ্ঞ সৎসেবা করিয়া তিনি কোনো দেবাশীর্বাদ লাভ করিতে পারেন নাই। ফলে সৎপুরুষের সন্ধান পাইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতাভিলাষী হইতেন।

বক্রেশ্বর তীর্থ হইতে কপিলদেব নামক মহাপুরুষ রাজ্য মধ্যে আসিয়াছেন,—রাজ্যাধীশ্বর সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া মিলন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সেই সৎপুরুষ সানন্দে তথাকার ভূপালের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

এই উন্নত পুরুষকে রাজা নিজ মনোদুঃখ অর্থাৎ তিনি যে নিঃসন্তান রহিয়াছেন,—সে কথা প্রকাশ করেন। কপিলদেব দেশপালকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিয়া কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

বৎসারান্তে মিথিলাধিপতি এক পুত্র লাভ করিলে, সেই সুসংবাদ জানাইতে নানা উপঢৌকন সহ তিনি বক্রেশ্বর তীর্থে কপিল দেবের নিকট লোক পাঠাইলেন। দেশপালকের সর্বাঙ্গীন কুশল এবং পুত্রলাভের সংবাদ অবগত হইয়া তপস্বী বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দেশনায়কের সেই লোকগুলি এই তীর্থে কিছুকাল বাস করিবার পর স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদের দ্বারা মিথিলাধিপতিকে সংবাদ প্রেরণ করেন "এই তীর্থের মূল বক্রনাথের দেবমন্দির ও কুণ্ডগুলির সংস্কার, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্যে দেশপালক যেন যথোচিত মনোযোগ দেন।"

কৃতজ্ঞ মিথিলাধিপতি চন্দ্রনারায়ণ মহাত্মা কপিলদেবের বাক্য শিরোধার্য করিয়া বক্রেশ্বরদেবের মূল মন্দির, কুণ্ড ইত্যাদির সংস্কার কার্য ও পুষ্করিণী খনন করিতে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন।

এস্থানে যে-সর্ববৃহৎ জলাশয় "চন্দ্রসাগর" নামে খ্যাত, তাহা উক্ত মিথিলাধিপতি খনন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে এই পুষ্করিণীর নামাকরণ হয়।

নব গঠিত মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে দ্বারের পার্শ্বে দুই প্রস্তরস্তম্ভের উপরিভাগে মধ্যস্থলে যে-বৃহৎ শিলাখণ্ড রহিয়াছে, তাহা প্রাচীন মৈথিল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাহার প্রথম ছত্র কয়টিতে বক্রেশ্বর দেবের স্তুতি ও দেশপালকের বক্রেশ্বরদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ লিখিত আছে। সর্বনিম্ন ছত্রে সন তারিখ প্রভৃতি খোদিত রহিয়াছে।

বহু সাধ্য সাধনা, অর্ঘাঞ্জলি, অর্চনা বন্দনার পর মিথিলাধিপতি চন্দ্রনারায়ণ যে-পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'দেব সন্তোষ' রাখা হয়।

পূর্বে 'চন্দ্রসাগর' পুষ্করিণীর তিনদিকে ইষ্টক নির্মিত ঘাট ছিল। ইহার পূর্ব

দক্ষিণ ভাগে সাত খাটুলে নামক এক পুষ্করিণী রহিয়াছে। দীর্ঘকাল পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় ইহার নিম্নভাগ পঙ্কে পূর্ণ হয়।

গ্রামের পূর্বে দামোদর জলাশয় আছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম ভাগে গ্রামের দিকে এক ইষ্টক নির্মিত ঘাট ছিল।

সাহআলম কর্তৃক প্রদত্ত তাম্রলিপি এবং বীরভূম জেলায় এস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে রাজনগরের রাজা কর্তৃক অনুমোদিত বক্রেশ্বর দেবের সেবাকার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বিঘা নিষ্কর জমিদান করা হইয়াছিল। ঐ ভূমির পূর্বাংশ অনুযায়ী সেবায়েতগণ নিজ সেবাকালে বক্রনাথের ভোগ-আরতি পরিচালনা করেন।

মন্দির অঙ্গনে শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, অপর পতিত ভূখণ্ড হইতে আনীত একখণ্ড প্রস্তরে "মহিসুর আখরা" খোদিত আছে। তাহা হইতে অনুমান হয়, ভারতের দক্ষিণে মহীশূর দেশীয় কোনো সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এস্থানে কোনো এক সময়ে আশ্রম করিয়াছিলেন। কালে তাহা লুপ্ত হয়।

উহার পূর্ব পার্শ্বে অপর স্থান হইতে সংগৃহীত এক প্রস্তর খণ্ডে "সূর্য নারায়ণ" এই নাম খোদিত আছে। তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, সৌর উপাসক কোনো সম্প্রদায় এস্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন।

শিবরাত্রির সময় এই তীর্থে আট দিন ধরিয়া মহামেলা হয়। বহু স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভৈরবী মন্দিরের চতুর্ভাগে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। এই সময় শ্বেতগঙ্গার উত্তরপূর্বভাগে অক্ষয়বটমূলে বৈষ্ণব সম্প্রদায় আসিয়া অন্নক্ষেত্র করিয়া থাকেন। দোকান পসারি, যাদুকর, ছায়াচিত্র প্রভৃতি আসিয়া কয়েকদিন এই নিভৃত ভূমিকে জনকোলাহলে পূর্ণ করে। সেই সময় বহুদূর হইতে দর্শনাভিলাষী পূজার্থী ও ভক্তের সমাগম হয়। তাঁহারা বক্রনাথের পূজা-অর্চনা করে। এই পর্ব উপলক্ষে এই তীর্থটি এক বিরাট মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বক্রনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণে এক উচ্চ বাঁধানো স্থানে ভোগঘর রহিয়াছে। ইহার সোপানের পূর্বভাগে দাওয়ার গাত্রে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত এক ইষ্টক ফলকে মন্দির স্থাপনের কাল শকাব্দ ১১৬৮ ও স্থাপকের নাম লিখিত আছে। ফলকে খোদিত উক্ত অক্ষরগুলি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।

বক্রনাথ মন্দিরের সর্বোচ্চ শিরের মধ্যভাগে এক বৃহৎ গোলাকার সহস্র-দলের ন্যায় খোদিত প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত হইয়া চূড়ার শোভা বর্ধন করিতেছে। মন্দির গঠন কালে মন্দির শীর্ষের অতি ঊর্ধ্বে এই বিরাট প্রস্তর বহু ক্লেশে উত্থিত হইয়াছিল।

শ্মশানে শবদাহকারী, পাটুনি, ডোম ইত্যাদি জাতি নিজ অংশ অনুপাতে নির্দিষ্ট দিনে শবসৎকার করে। মৃতদাহের জন্য কেহ সঙ্গে কাষ্ঠ লইয়া আসে বা দোকানে কয়লা ক্রয় করিয়া শ্মশানবন্ধুরা দাহ কার্য সমাধা করে এবং তাহারা শ্মশানে সৎকারক্রিয়ার জন্য সামান্য কিছু জমা দিয়া থাকে। এ স্থানের চারিটি দোকানে শবদাহকারীরা আসিয়া নিজেদের সুবিধা মত আশ্রয় লয়। শ্মশানে যে-কাষ্ঠ বাহির হইতে আসে, তাহার এক খণ্ড দেউলে ধুনি ঘরের জন্য প্রদত্ত হয়। সেই কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা মন্দিরের ধূপ দেওয়া হয়। শ্মশানের অর্থাগম হইতে এ তীর্থে আগত সাধুগণকে সেবার জন্য একটি নির্দিষ্ট দোকান হইতে সদাব্রত দেওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে কতগুলি সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভৈরবী আশ্রম করিয়া আছেন। তাঁহাদের সেবাভিক্ষা দ্বারা অথবা ভক্তগণের আনীত ও প্রদত্ত দ্রব্য দ্বারা সন্ন্যাসীবর্গের সেবা পরিচালিত হয়। আশ্রমবাসিগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভিক্ষালব্ধ বস্তু লইয়া আপন সেবা বা কেহ সামর্থ অনুযায়ী বহিরাগত সাধুসজ্জনের সেবা করাইয়া থাকেন।

এ স্থানে চতুষ্পার্শ্বে বহু প্রাচীন শিব মন্দির ভক্তপ্রাণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও অনেক শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় স্তবক

পঞ্চ শিবলিঙ্গ :—মূল বক্রনাথ শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া পঞ্চ শিবলিঙ্গ এ ধামে অবস্থান করিতেছেন।

বক্রনাথ দেবের ভোগ মন্দিরের পশ্চিমে কুবেরেশ্বর শিব আছেন।

শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণপূর্বভাগে বক্রনাথের নাটশালার উত্তরে সিদ্ধেশ্বর শিব আছেন। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিম্নে এক প্রস্তর ফলকে ১২৯৫ শকাব্দ লিখিত আছে। অনুমান হয়, জনৈক দাস উপাধিধারী ভক্ত উক্ত শিব মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার অথবা উহা নূতন করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

শ্বেত গঙ্গার উত্তরে জ্যোতির্লিঙ্গেশ্বর শিব আছেন। শ্বেতগঙ্গার উত্তর পশ্চিম ভাগে কালা রুদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন।

শ্বেতগঙ্গার উত্তর পূর্ব কোনাংশে এক শিবলিঙ্গ আছেন। পূর্বকালে জম্ভ নামে এক দৈত্য মহাদেবকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই দৈত্যের নাম অনুসারে এই শিবলিঙ্গ জম্ভেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন।

বৎসরের পর্ব উপলক্ষে শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিতে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি, পৌষ মাসের সংক্রান্তি, মাকরী সপ্তমী, শিব চতুর্দশী, দোল পূর্ণিমা, বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি ও দশহরার দিন স্নানার্থীরা এ তীর্থে আসিয়া থাকেন। ঐ দিনগুলিতে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র মেলা বসে। গ্রহণ বা বিশেষ কোন পর্ব উপলক্ষে বহু যাত্রী স্নানে ও বক্রনাথ দর্শনে আগত হয়। এ স্থানের উষ্ণজল পান করিলে অম্লরোগ এবং এই জলে স্নান করিলে চর্মরোগ ও বাতব্যাধি প্রভৃতির উপশম হয়।

কালীমাতার বেদী :—অক্ষয় বটবৃক্ষের পূর্বাংশে এবং শ্বেতগঙ্গার উত্তর পূর্ব কোণে ইষ্টক নির্মিত এক প্রশস্ত বেদী আছে। ইহা কালীমাতার বেদী নামে খ্যাত। অধুনা এ স্থানে কোনরূপ পূজা হয় না। শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে এক সাধুব্যক্তি ঐ বেদিকা নির্মাণ করেন এবং দীপান্বিতা কালী পূজার দিন তথায় মাতার মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া নিজে নিশীথরাত্রে সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিয়াছিলেন। পূজা সমাপনান্তে স্বল্প আয়োজনে সেই সাধু দৈবসাধন ও অলৌকিক কৃপাশক্তি বলে বহু লোককে দেবীর প্রসাদ সেবা করাইয়াছিলেন।

দুর্গামূর্তি :—বক্রেশ্বর গ্রামের মধ্য ভাগে দুর্গামন্দিরে এক দুর্গা মূর্তি স্থাপিত আছে। কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এক গৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র জলাশয়ের পার্শ্বের মৃত্তিকা প্রয়োজনবশত খোদিত হইয়াছিল। সেই সময় তথায় এক শিলাখণ্ড দৃষ্ট হয়। ঐ শিলাখণ্ডের অপরভাগে অষ্টাদশভুজা দেবী মূর্তি খোদিত রহিয়াছে, ইহা পরিলক্ষিত হয়। পরে ঐ মূর্তি সে-স্থান হইতে উঠাইয়া সংস্কারান্তে তাঁহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই গ্রামের আচার্য পরিবার এই মূর্তির সেবা করিয়া থাকেন। শারদীয় দুর্গা পূজার সময় চারিদিন ঐ স্থানে দেবীর পূজা হয়। পল্লীর মধ্যভাগে এক কুটীরে এই দেবীমূর্তি রক্ষিত আছেন এবং তথায় নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

অক্ষয় বটবৃক্ষ :—শ্বেতগঙ্গার উত্তরভাগে অক্ষয় বটবৃক্ষ বর্তমান আছে। পুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ এবং বক্রেশ্বর এই চারি তীর্থে শিবের জটা হইতে এক মূল উদ্ভূত হইয়া অক্ষয় অবস্থায় সর্বযুগে বৃক্ষরূপে বিরাজ করিতেছে। এই বটবৃক্ষ বিস্তৃত হইয়া শ্বেতগঙ্গার উত্তর দক্ষিণ উভয়কূল শাখা প্রশাখায় আচ্ছাদিত করিয়াছে। ইহার মূল দেশের দক্ষিণাংশে ষষ্টিমাতার পূজা হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের মূল, আদি ও প্রধান কাণ্ড লোপ পাইয়া, তাহার নামাল ও তৎনির্গত শাখা বৃক্ষ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া তীর্থের শোভা বর্ধন করিয়াছে। চতুর্দিকের ভগ্নমন্দির হইতে বা অপর অনাদৃত স্থানে অরক্ষিত শিবলিঙ্গগুলি উঠাইয়া এই বৃহৎ বৃক্ষমূলে রক্ষিত হইয়াছে।

কেলিকদম্ব বৃক্ষ :—শ্বেতগঙ্গার উত্তর-পশ্চিম ভাগে পুরাকালে অতিপ্রাচীন কেলিকদম্ব বৃক্ষের ন্যায় এক তরু ছিল। কালে উহা মৃত হওয়ায় লোপ পাইয়াছে। এক গোলাকার বেদীর উচ্চ স্থানে ঐ বৃক্ষ ছিল। ভগ্ন উচ্চ গোলাকার স্থানটি পুনরায় খাকিবাবা পূর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। উহার নিম্নে যে ভৈরব মূর্তিটি স্থাপিত ছিল এখনও তাহা বর্তমান আছে। ঐ স্থানে খাকিবাবা এক নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করেন।

শ্রীমাধব মূর্তি :—পাপহরার উত্তর পশ্চিমাংশে, উপস্থিত যে স্থানে কালীবাড়ী স্থাপিত হইয়াছে, তথায় পূর্বকালে হ্যাঙ্গলা গোরে নামে একটি ছোট জলাশয়ের চৌদিকে কেয়াফুলের ঘনবন ছিল। উহারই পশ্চিম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। তাহার চতুষ্পার্শ্ব গোলাকার বেদী করিয়া বাঁধানো ছিল। তাহার পূর্ব ভাগে শ্রীমাধব মূর্তি অর্ধ প্রোথিত অবস্থায় ছিল এবং পশ্চিম ভাগে কয়টি শিবলিঙ্গ ছিল। কালপ্রভাবে অযত্নে ও অলক্ষ্যে থাকায় স্থানটি ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়। কালীবাড়ীর মন্দির করিবার সময় ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদিত হয়। ঐ স্থান খনন ও অশ্বত্থ বৃক্ষমূল ছেদন সময়ে শ্রীমাধবের নিম্নভাগ খণ্ডিত

হয় এবং তাহার উপরের অর্ধভাগ স্থানান্তরিত করা হয়। শৃঙ্গার বেশে শ্রীরাধামাধব মূর্তি ও শিবলিঙ্গগুলি অক্ষয় বটবৃক্ষ মূলের পূর্বভাগে শ্বেতগঙ্গার উত্তরে উপস্থিত রক্ষিত আছে।

মহাত্মা খাকি বাবার ঐ সময় এ তীর্থে প্রবল প্রভাব এবং তাঁহারই আদেশে কালীমন্দির স্থাপিত হয়। সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদন এবং শ্রীমাধব মূর্তি অপসারিত হইয়াছিল।

অশ্বত্থ বৃক্ষের অধোভাগে শৃঙ্গার বেশ শ্রীরাধামাধব মূর্তি বহু যুগ পূর্বে স্থাপিত ও সেবিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল অনাদৃত অবস্থায় থাকায় এবং নিম্নাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়ায় উপরিভাগ প্রকাশিত ছিল। যাঁহাদের মনে ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হইত, তাঁহারা আসিতেন ঐ অলক্ষিত অনাদৃত শ্রীরাধামাধব মূর্তির নিকট পুষ্পাঞ্জলি দিতে। উপরিউক্ত শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে স্থিরচিন্তার পর যেরূপ মনে উদয় হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বঙ্গাব্দ ৩৫০ সালে গঙ্গার ও অজয় নদীর সঙ্গমস্থল উদ্ধারণপুর গ্রামের নিকট এক নিষ্ঠাবান ধনী ব্রাহ্মণ ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর তাঁহার বৈরাগ্য ভাব উদয় হওয়ায়, নিজ পুত্রগণের হস্তে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া তিনি নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু শাস্ত্র শুনিয়া তাঁহার মন তৃপ্ত হয় নাই। তথা হইতে বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করিয়া তিনি মিথিলা দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রখ্যাত কবি বিদ্যাপতির অনুরাগী কোনো সৎপুরুষের সহিত মিলনেচ্ছায় ভক্ত ব্রাহ্মণ তথায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মিথিলা দেশে উক্ত ব্রাহ্মণ ঘটনাক্রমে এক রসিক পুরুষ ব্রাহ্মণকুলজাত মাধব নামে এক বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার নিকট ভক্ত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা লইলেন এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

কয়েকবৎসর গুরুগৃহে অবস্থান করার পর পুনরায় বঙ্গদেশ অভিমুখে সেই ব্রাহ্মণ যাত্রা করেন। সে সময় ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের বহুল প্রচার ছিল। তদ্ব্যতীত, লোকে বিষহরি, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি পূজা ও পাঁচালি করিত এবং শুনিত।

পুনরায় ঘুরিয়া আসিবার পথে কৌলের দেশ উচ্চরাঢ় খণ্ডে বক্রেশ্বর তীর্থে দীক্ষিত বৈষ্ণবব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় এই তীর্থে অল্প সংখ্যক ত্যাগীপুরুষ সাধনরত ছিলেন। তাঁহাদের উদার উন্নত মুক্তভাবে অতি আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রেমিক সৎব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্বয়ং এই তীর্থে বাস করেন।

প্রধান বক্রনাথ মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে বর্তমান পুষ্করিনীগুলির পূর্ব ভাগে

উক্ত বৈষ্ণব নিজ আশ্রম গঠন করিয়াছিলেন। গুরুকে অনুরোধ করিয়া উক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, এই বৈষ্ণববেশ শ্রীরাধামাধবের মূর্তি ভাস্করের দ্বারা উত্তরাঞ্চলের প্রস্তর দিয়া নিজে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এবং এই স্থানে তিনি এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘকাল শিষ্যপরম্পরায় ঐ সেবা চলিয়াছিল। প্রায় আড়াইশত বৎসর পর ঐ সেবা পতিত হইয়া যায়। কাল প্রভাবে তাঁহার আশ্রম ও সেবক লুপ্ত হওয়ায় দেবমূর্তি সেবাহীন অবস্থায় রাখা সমীচীন নহে এই জ্ঞানে গ্রামবাসী সেবায়েতগণ ঐ শিলামূর্তি লইয়া আসিয়া এক প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ইষ্টক নির্মিত বেদীমূলে তাহা রক্ষিত করেন। পুনরায় সেই স্থান হইতে অক্ষয় বটবৃক্ষের নিম্নভাগে ঐ শ্রীবিগ্রহের আশ্রয়স্থল হইয়াছে।

এইরূপ শ্রুত হয় যে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী ছাতুবাবু লাটুবাবু এক সময় এই তীর্থে আসিয়াছিলেন। উপরিউক্ত শ্রীমূর্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহা কলিকাতায় নিজালয়ে তাঁহারা লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেবায়েতগণের সম্মতি পাইয়া তাঁহারা পাল্কী করিয়া ঐ শ্রীমূর্তি কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমূর্তি তথায় লইয়া যাইবার পর তাঁহাদের স্বপ্নাদেশ হয় "তোমরা আমায় যে-স্থান হইতে লইয়া আসিয়াছ তথায় অতি সত্বর রাখিয়া আইস।" এই আদেশ পাইয়া ধনীব্যক্তিগণ উপরিউক্ত শ্রীমূর্তি বক্রেশ্বরে পাঠাইয়া দিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করেন।

সপ্ত কুণ্ড ঃ—এই তীর্থে সপ্তকুণ্ড রহিয়াছে; যথা, ক্ষারকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, নৃসিংহ কুণ্ড বা অগ্নি কুণ্ড, ব্যাস কুণ্ড বা সৌভাগ্য কুণ্ড, সূর্য কুণ্ড, জীবৎস কুণ্ড, এবং ব্রহ্মা কুণ্ড।

ক্ষার কুণ্ড ঃ—পাপহরার-উত্তরে ভৈরব কুণ্ডের পূর্বসংলগ্ন স্থানে ক্ষারকুণ্ড অবস্থিত। পূর্বকালে অগস্ত্য মুনির ভয়ে ভীত হইয়া মহালবণসাগর এই কুণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই হইতে এই কুণ্ডের জল ক্ষার হইল। তদবধি ইহা ক্ষারকুণ্ড নামে খ্যাত হয়। এ তীর্থে আসিয়া সর্বপ্রথম এই কুণ্ডজল স্পর্শ করিতে হয়। তদ্বারা মহাদেব কুণ্ডেশ্বর রূপে অর্চিত হন।

ভৈরব কুণ্ড ঃ—যখন পৃথিবীর বহুলাংশ জলপ্লাবিত হয়, ভৈরবদেব সকল চরাচর বিনষ্ট করেন। এই কার্যের ফলে তাঁহার দেহে জ্বালা উপস্থিত হয়। তিনি সে-জ্বালা নিবারণ করিতে কোনক্রমেই যখন সক্ষম হইলেন না, তখন এই তীর্থে তিনি এক কুণ্ড খনন করেন। পাপহরা নদীর জল তন্মধ্যে পূর্ণ করিয়া ঐ জলে নিমজ্জিত হইয়া তখন তিনি নিজ দেহের জ্বালা দূর করেন। সেই হইতে ঐ কুণ্ডের নাম ভৈরবকুণ্ড হইয়াছে। পাপহরা নদীর উত্তর ভাগে এই কুণ্ড অবস্থিত।

নৃসিংহ কুণ্ড বা অগ্নিকুণ্ড ঃ—নৃসিংহকুণ্ড পাপহরার সর্ব উত্তরাংশে অবস্থিত। পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে, সিংহরূপে নারায়ণ যখন হিরণ্য কশিপুকে বধ করিলেন তখন তাঁহার দেহজালা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কোথাও তাহা নিবারণ করিতে না পারায়, এ তীর্থে আসিয়া এই কুণ্ডে তিনি নিমজ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার দেহজ্বালা দূর হইলে এই কুণ্ডের জল অধিক তাপযুক্ত হয়। ইহার ফলে জ্বালা কুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড বা নৃসিংহ কুণ্ড নামে এই কুণ্ড খ্যাত হয়।

এই কুণ্ডের জল সর্বোচ্চ তাপ যুক্ত ১৬২° ডিগ্রি। এই জলের গুণ এই যে কোনো অম্ল শূল বা উদর পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ তপ্ত জল শীতল করিয়া পান করিলে সে রোগমুক্ত হয়।

সূর্য কুণ্ড ঃ—পৌরাণিক যুগের পর সূর্যকুণ্ড আবিষ্কৃত হয়। পাপহরা নদীর সর্বউত্তর-পূর্বভাগে এই কুণ্ড অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্রাকার এবং উচ্চ তাপ যুক্ত। উষ্ণ কুণ্ডগুলি হইতে গরম জল বুদ্বুদ আকারে দিবারাত্র উপরে উঠিতেছে এবং তৎসঙ্গে বাষ্পরাশি ধূম্রাকারে উত্থিত হয়।

সৌভাগ্য কুণ্ড বা ব্যাস কুণ্ড ঃ—পুরাণে কথিত আছে, কামদেব মদন নিজ রূপলাবণ্যে দেবাদিদেব ভবেশকে মোহিত করিতে গিয়া ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। দেবী ভগবতী চিন্তা করিলেন যে আরও কত রূপ লাবণ্য লাভ করা সম্ভব যাহা দ্বারা শিব মোহিত হইতে পারেন। সৌভাগ্য ও রূপলাবণ্য কামনা করিয়া এই তীর্থে নিরাহারা বল্কলবসনা হইয়া উমা কঠোর তপস্যা করিলেন। দেবেশ পার্বতীর মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট সৌভাগ্য ও রূপরাশি বরদান করিলেন। দেবীর তপোবলে এই কুণ্ড সৌভাগ্যকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। ইহার অপর নাম ভগবতী কুণ্ড। তৎপরে দেবীকে সুরেশ সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেন।

দৈবকৃপায় লেখক জানিয়াছিল যে এই কুণ্ডের অপর এক নাম ব্যাস কুণ্ড। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অংশে বক্রেশ্বর দেবের যে-স্তুতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'ব্যাস কুণ্ড' এই নাম উল্লিখিত আছে। কোন পৌরাণিক গ্রন্থে এ নাম লিখিত আছে কিনা তাহা জানিবার আমার সুযোগ ঘটে নাই। তবে কৃপাবাণীর উপর বিশ্বাস করিয়া এ নামটি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

আর একটি আখ্যানে কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, বিশ্বেশ্বরকে পুনরায় পতিভাবে লাভ করিতে ভগবতী এই তীর্থে আসিয়াছিলেন। শ্বেতগঙ্গার উত্তরে তরুমূলে, যে-স্থানে উচ্চবেদীর উপর উপস্থিত

এক নিম্ব বৃক্ষ রহিয়াছে তথায় যোগাসনে যোগেশ্বরী অপর্ণা পত্ররস পর্যন্ত গ্রহণ না করিয়া নিজাসনে আসীনা ছিলেন। এই সৌভাগ্য কুণ্ডের জল তিনি প্রয়োজন বোধে কখনো কখনো ব্যবহার করিতেন। দেবীর কঠোর ও তীব্র সাধনায় তুষ্ট হইয়া মহেশ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। উমার ব্যবহৃত এই কুণ্ড হইতেই তাঁহার ভাগ্যোদয় হওয়ায় এই কুণ্ডের নাম সৌভাগ্যকুণ্ড হয়।

এই কুণ্ডের জল এক বিশিষ্ট গুণ সমন্বিত। ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য অনুদয়ে এই কুণ্ডের জল ঈষৎ জল-মিশ্রিত দুগ্ধের বর্ণ ধারণ করে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহা ক্রমশ লোপ পায় ও স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।

জীবৎস কুণ্ড বা অমৃত কুণ্ড :—মূল মন্দিরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে জীবৎস কুণ্ড অবস্থিত। কেবলমাত্র এই কুণ্ডের জল শীতল এবং ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুতে ইহার জলের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সকল সময়ে সমভাবে থাকে। এই কুণ্ডে জলপ্রবেশ অপরস্থান হইতে করে না বা কুণ্ডের জল নিষ্কাষিত হয় না।

এক আখ্যানে কথিত আছে, পুরাকালে অতি শুদ্ধ আত্মা এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দিয়া আসিবার সময় এক হিংস্র ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে বধ করিল। গভীর অরণ্যে পতিহত্যায় কাতর হইয়া ব্রাহ্মণী সকরুন রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিহ্বল অবস্থায় পতিহারা নারী যখন কখনো চেতন কখনো সংজ্ঞাহীন তখন দৈববাণী হয় যে, বক্রেশ্বর তীর্থের অমৃত কুণ্ডের জলে তাঁহার মৃত স্বামীর অস্থি নির্মজ্জিত করিলে মৃত ব্রাহ্মণ পুনর্জন্ম লাভ করিবে।

এই আদেশ অনুযায়ী উক্ত ব্রাহ্মণসহধর্মিনী মৃতস্বামীর অস্থিখণ্ড লইয়া অমৃতকুণ্ডে নিমজ্জিত করিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবকৃপায় তৎক্ষণাৎ দিব্যঅঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই দেবাদিদেব বক্রেশ্বরের পূজা দ্বারা নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আর এক পৌরাণিক আখ্যান আছে। বৃহস্পতির ভার্যা হরণ অপরাধে শিব কর্তৃক দণ্ডিত হওয়ায় দশ সহস্র বৎসর চন্দ্রগুরু এই তীর্থক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কঠোর তপোব্রতী ছিলেন। ভবেশ তাঁহার উগ্রতপে তুষ্ট হইয়া পাপমুক্তি বরদান করেন। চন্দ্রদেব পাপমুক্ত হইয়া এই কুণ্ডে অমৃত দান করেন। তাহাতেই ইহার অপর নাম অমৃত কুণ্ড।

আর এক কিংবদন্তী আছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই তীর্থ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে রাজনগরস্থ মুসলমান রাজা কর্তৃক এক ধীবর আদিষ্ট

হয় যে রাজাকে প্রতিদিন জীবিত মৎস্য দিতে হইবে। প্রতিদিন জীবিত মৎস্য কিরূপে সংগ্রহ করিয়া তাহা রাজসমীপে উপস্থিত করিবে—এই ভাবনায় অস্থির হইয়া ধীবর অবশেষে দেবাদিদেব মহাদেবের শরনাপন্ন হইল। তাঁহার কৃপালাভে ধীবর অবগত হয়, মৃতমৎস্য এই জীবৎস কুণ্ডের জলস্পর্শে জীবিত হইয়া উঠিবে।

ধীবর ঐ দৈব বাক্যানুসারে প্রতিদিন মৃতমৎস্য আনিয়া কুণ্ডের জলস্পর্শে তাহা জীবিত করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইত। রাজা ধীবরকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিদিন তুমি জীবিত মৎস্য আনিতে কিরূপে সক্ষম হও?"

ধীবর রাজাকে সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

রাজা এই কথা শুনিয়া এক মৃত 'পক্ষী লইয়া আসিয়া জীবৎস কুণ্ডের জলে নিমজ্জিত করিলেন ও নিজেও ঐ জল স্পর্শ করিলেন। বিধর্মীর জলস্পর্শে কুণ্ডের সেই মৃত সঞ্জীবনী শক্তি সেই দিন হইতে লোপ পাইল।

পরে এক দিন দৈববাণী হইল যে যদিও কুণ্ডের মৃত সঞ্জীবনী শক্তি লোপ পাইয়াছে তথাপি অতঃপর মৃতবৎসা দোষযুক্তা কোনো নারী পবিত্রভাবে ভক্তি-পূর্বক এই কুণ্ডজলে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ করিবে। অধুনা বহুনারী সন্তান কামনায় এই জলে স্নান করে।

ব্রহ্মাকুণ্ড :—ব্রহ্মাকুণ্ড বক্রেশ্বর দেব মন্দিরের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। পৌরাণিক আখ্যানে কথিত আছে, একদা ব্রহ্মা মদনপীড়িত হইয়া কন্যার প্রতি কাম দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এই অপরাধে ভবেশ তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করেন। ঐ পাপমোচনের জন্য বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া ব্রহ্মা এক কুণ্ড খনন করেন। অতঃপর তন্মধ্যে তিনি অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া ঘৃতাহুতি দান করিতেন। ব্রহ্মা এইরূপে বিংশ বৎসর যাপন করিলে, অনাদিনাথ তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে পাপমুক্ত করিলেন, এবং তৎসঙ্গে এই বরদান করিলেন যে ঐ কুণ্ডজল পান করিলে ব্যভিচার-রূপ পাপ হইতে মনুষ্যজাতি মুক্ত হইবে এবং ধর্ম লাভ করিবে।

শ্বেতগঙ্গা :—বক্রেশ্বর দেবের মূলমন্দিরের উত্তরাংশে শ্বেতগঙ্গা অবস্থিত। বস্তুত ব্রহ্মাকুণ্ডের সঞ্চিত জলরাশিই শ্বেতগঙ্গা নামে খ্যাত হয়। এই শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণভাগে জলে নামিবার তিনটি ঘাট এবং শ্বেতগঙ্গার উত্তরভাগের পূর্বাংশে অক্ষয় বটমূলে একটি ক্ষুদ্র ঘাট রহিয়াছে। এই গঙ্গার তিনদিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। শ্বেতগঙ্গার মধ্যভাগে দুইহাত উচ্চ দুই পার্শ্বে দুই স্তম্ভ এবং তাহার মধ্যভাগে বৃহৎ শিলাখণ্ড স্থাপিত আছে। জল মধ্যে ডুবিয়া ঐ খিলানের ভিতর

দিয়া পারাপার করিলে যমযন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না—এইরূপ কথিত আছে। তীর্থযাত্রিগণ আসিয়া কেহ কেহ উহার মধ্য দিয়া জলে ডুবিয়া যাতায়াত করেন। ইহাই যমদ্বার নামে খ্যাত হয়। শ্বেতগঙ্গার মধ্যস্থানে কোথাও কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণের জল উত্থিত হয়।

শ্বেতগঙ্গার জলে বক্রনাথের পূজা-ভোগ-রন্ধন প্রভৃতি সকল কার্য সম্পন্ন হয় এবং স্নানার্থিগণ এই গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করে।

এই কুণ্ড সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। সত্যযুগে শ্বেত নামে এক রাজা এ স্থান হইতে বিংশ ক্রোশ দূরে নিজ রাজ্যের রাজধানী মঙ্গলকোট হইতে বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া প্রাতে স্নানান্তে দেবেশের পূজা আরাধনা করিয়া সন্ধ্যাকালে নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইতেন। প্রতিদিন ভক্তিভাবে এইরূপ দেবসেবা করায় দেবেশ তুষ্ট হইয়া রাজাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে রাজা বলিলেন, "বহুধারায় পূর্ণা হইয়া গঙ্গা মর্তলোকে প্রবাহিত হইতেছেন। তদ্রূপ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া জলধারা ভোগবতীর জলস্রোত পৃথিবীর তলে বহিতেছে। আমার নামানুসারে এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় কিছু রক্ষা হয় এবং অন্তিমে যাহাতে আপনার চরণ লাভ হয়—এই বর দিন।" বিভুনাথ তুষ্ট হইয়া শ্বেতরাজার নামানুসারে এই জলাধারের শ্বেতগঙ্গা নাম দান করেন। এই পবিত্র জল তদবধি দেবকার্যে ব্যবহৃত হয়।

বৈতরণী :—নৃসিংহকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড ও ভৈরবকুণ্ডের জল নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণ ভাগে যে-স্থানে পাপহরার সহিত মিলিত হইতেছে, সেই স্থানকে বৈতরণী বলে। পাতাল ভেদ করিয়া জলরাশি উত্থিত হইতেছে বলিয়াই ইহার নাম ভোগবতী এবং মর্তলোকে গঙ্গা নামে প্রবাহিতা। একস্থানে নিঃসৃত কুণ্ডজল, ভূগর্ভ আগত জল এবং শ্বেতগঙ্গার বারিধারা মিশ্রিত হওয়ায় এই স্থানে ত্রিধারা বহিতেছে। এই স্থান বৈতরণী নামে খ্যাত।

এই স্থান অতিক্রম করিয়া অপর পারে গেলে, লোকে যমভয় মুক্ত হয়। অধুনা তীর্থযাত্রিগণ আসিয়া গোদান গোসেবা প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়া সংক্ষেপে পুণ্য কর্ম বৈতরণীর তীরে সমাধা করে।

এই বৈতরণী ঘাটের পূর্বভাগে ব্রাহ্মণগণের পৃথক শ্মশান রহিয়াছে। তাঁহাদের মৃত দেহ এই স্থানে দাহ করা হয়। ইহার পূর্ব ভূখণ্ডে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বা অপর কাহারও কাহারও সমাধি দেওয়া হয়। স্থানের মূল্য দিয়া তবে সমাধি- দিবার অধিকার পায়। ব্রাহ্মণগণের শ্মশানের উত্তরে শবদাহ-কারিগণের জন্য একটি আশ্রয়স্থল রহিয়াছে।

ষষ্ঠীমাতা :—অক্ষয়বট মূলে গ্রামবাসীমাতাগণ আসিয়া সন্তানগণের মঙ্গল-কামনায় পর্বাদি উপলক্ষে ষষ্ঠী পূজা করিয়া যান।

পাপহরার দক্ষিণপশ্চিম ভাগে শূদ্রগণের পৃথক শ্মশান ক্ষেত্র রহিয়াছে। পশ্চিমভাগে শবানুগামিগণের জন্য এক আশ্রয়স্থলও রহিয়াছে।

চড়কতলা—পাপহরার দক্ষিণ ভাগে পূর্বাংশে, যে-স্থান উপস্থিত বড় বাগান নামে খ্যাত, তথায় বহু পূর্বে চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় কাষ্ঠের চড়কগাছ ঘুরিত। বহু উপবাসী সন্ন্যাসী তথায় উৎসব নির্বাহ করিতেন। তথায় মৃত্তিকা গর্ভে এক বিরাট শিবলিঙ্গ প্রোথিত অবস্থায় আছে।

অষ্টাবক্র মুনি

পুরানে কথিত আছে, কহোড় মুনির পুত্র সুব্রত-ই অষ্টাবক্র মুনি নামে খ্যাত হইয়াছেন। পুরাকালে সুব্রত ও লোমশ মুনি দুইজনই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। সুব্রত ও লোমশমুনি একত্র স্বয়ম্বর সভা মধ্যে প্রবেশ করেন। ইন্দ্রদেব তথায় পাদ্যর্ঘ লইয়া প্রথম লোমশ মুনির বন্দনা করেন। ইন্দ্রদেবের এইরূপ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সুব্রতমুনি সভা ত্যাগ করিয়া যান। ঐ অবস্থায় অত্যধিক ক্রোধবশত তাঁহার অষ্ট অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া বক্রাকার লাভ করে।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে পরে মুনিবর বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হন। "গৌড়দেশে রাঢ়খণ্ডে 'গুপ্তকাশী' নামক এক স্থান আছে তথায় তুমি যাও"—বিশ্বনাথ কর্তৃক তিনি নাকি এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মুনিবর সন্ধান করিয়া এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষেত্রে অষ্টাবক্র মুনি ষাটহাজার বর্ষ কঠোর তপস্যা রত থাকেন; তন্মধ্যে দশহাজার বর্ষ হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ হইয়া উগ্র তপোরত ছিলেন। চতুর্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া কখনো বা তিনি আর-ও কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতেন। তিনি তপোপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বাহ্য বিষয়ে দৃকপাত না করিয়া একনিষ্ঠভাবে আত্মকার্যেই নিযুক্ত ছিলেন। মুনিবর যে-অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে পার্থিব অপার্থিব উভয় সম্পদেরই অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সেসব বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া তিনি কেবল স্বকর্মে মগ্ন থাকিতেন। গভীরতম যোগসাধনায় যে-জ্ঞানলাভ তিনি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দ্বারা লিখিত অষ্টাবক্র-সংহিতা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

মুনিবর অষ্টাবক্রের কঠোর সাধনায় যোগেশ তুষ্ট হইয়া অন্তিমে তাঁহাকে এই বরদান করিয়াছিলেন—"এই তীর্থে তোমারই নামানুসারে আমি বক্রেশ্বর নামে খ্যাত হইব, এবং শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শিবলিঙ্গে প্রথম পূজা তুমিই পাইবে। সে পূজা আমার শিবলিঙ্গের পার্শ্বেই হইবে।"

তদবধি মর্তলোকের এই ক্ষেত্রে শিবমহিমা প্রকাশিত হইল। একমাত্র অষ্টাবক্রমুনির তপোপ্রভাবে এই স্থানে বক্রেশ্বরদেবের লীলা প্রকট হয় এবং সেই

হইতে বক্রেশ্বরদেবের মহিমা চতুর্দিকে বিস্তৃত ও জ্ঞাত হয়। এক তপস্বীর তপোবলে ঐ জনশূন্য অরণ্য-ভূমি মহাতীর্থে পরিণত হয়। নিজ তপোপ্রভাবে অষ্টাবক্রমুনি যে-ভূমিতে তপস্যার অনুকূল ক্ষেত্র রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, পরযুগে সেই স্থানে বহু সাধক কর্মসিদ্ধ হন এবং অদ্যাপিও হইতেছেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, মুনি অষ্টাবক্র ত্রেতাযুগে বিরাজিত ছিলেন। তিনি মহর্ষি জনকের গুরু। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ধর্মালাপে যে-সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই অতি উচ্চাঙ্গের নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা। গুরু শিষ্যসম হওয়ায় তাঁহাদের আলোচনা অতি গভীর সত্যপ্রকাশে সক্ষম হইয়া সুজনগণকে উপকৃত করিতেছে। এই বিষয়বস্তু অষ্টাবক্র-সংহিতা নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আলোচ্য বিষয় নিগূঢ় তত্ত্বে পূর্ণ এবং চরম সাধনার পরম প্রকাশ বলিয়া সেই পুস্তকের দ্বারা প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই সংহিতা-গ্রন্থের মধ্যে কেবল মহর্ষি জনক এবং অষ্টাবক্র মুনির পারস্পরিক শাস্ত্রালোচনার সর্বোত্তম সদালাপ লিখিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুনিবর কোথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, কোথায় স্থিতিবান হইয়া সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। যে-অভিজ্ঞতা তাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে, সেই মহৎ সত্য লোক-সমাজে প্রকাশিত হইয়া প্রত্যক্ষের ন্যায় ধর্মপিপাসু মনুষ্যদ্বারা আস্বাদিত, অনুভূত ও আচরিত হইতেছে। গভীর সংজ্ঞা ও অমৃতময় সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া জগতে তাহা উন্মোচিত হওয়ায় মনুষ্যগণের বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

স্বল্পায়াসে তাহা সুলভ নহে। কঠোর তপস্যায় ভ্রান্তমন ইহাতে লুব্ধ নহে। পার্থিব বিষয়, বৈভব বা দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা এই অবস্থায় প্রিয় নহে। অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় বাহ্য বা আন্তর প্রকৃতির বিপর্যয় বা বিহ্বলতা ঘটিলেও যিনি তপস্যায় বিরত ছিলেন না, প্রতিপলে-প্রতিক্ষণে-প্রতিশ্বাস-প্রশ্বাসে সদাযুক্ত সেই অনলস কর্মব্রতী অপ্রাকৃত পুরুষ গভীর ধ্যানে কোন্ চিন্ময় লোকে বিরাজ করিয়া ভূলোকে বরেণ্য হইয়াছিলেন। কোনো পুঁথিতে সে-স্থানের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

কালনিয়ন্তা জগৎবিধাতার কর্মের যিনি সূক্ষ্মদ্রষ্টা, তাঁহার উল্লেখ করিয়া অগ্রে শুচি পশ্চাতে তৃপ্তি, সৎসাধনে অনিচ্ছা সৎব্রতে সুখী মানুষের ধর্ম বৈগুণ্য অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া অগ্রপশ্চাৎ চিন্তামুক্ত অতীন্দ্রিয় ভাবে বিরাজিত সেই মহামানব অষ্টাবক্রমুনি কালাতীত অবস্থার ঘটনাবলী অতি সরল প্রাঞ্জল আচরণে, মধুর সাধনোপায়, উন্নত তপস্বীর সদালাপে তাঁহার সংহিতায় উন্মেষিত করিয়াছেন।

বহু কৃচ্ছ্রসাধনায় সদাসুখী, অগ্রে উন্নত অবস্থা যোগে সদালোভী, অকিঞ্চিৎ বস্তু লাভে সদাবিরাগী, অমৃত সত্যের সন্ধানে সদা উন্মুখ, সেই একনিষ্ঠ কঠোর তাপস অষ্টাবক্রমুনি তপোবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহার কথিত সাধন পন্থায় সাধক বলিষ্ঠ হউক—এই অভিলাষে সত্য প্রকাশে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

উপনিষদ, রামায়ণ এবং মহাভারতে অষ্টাবক্র মুনির নাম উল্লিখিত আছে। সর্বক্ষেত্রে মুনিবর কঠোর তপস্বী ছিলেন। স্থান-কাল-পাত্র নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই। তীর্থ বক্রেশ্বরে যে-তপস্বী তপোব্রতী ছিলেন, তাঁহারই উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ সত্য প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে সর্বভারতের মধ্যে সংযোগ এবং গতায়াত ছিল। পথ দুর্গম এবং পথিমধ্যে হিংস্র পশু বা ব্যক্তির ভয় থাকিলেও সৎপিপাসু জনগণ তীর্থপর্যটনে বিমুখ ছিলেন না। ধর্ম সাধনে, তীর্থ দর্শনে, সৎমিলনে ধর্মার্থী মনুষ্যগণ বিভিন্ন যুগে অবাধে বিচরণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। পূর্বকাল হইতে সর্বভারতে এই রীতি প্রচলিত আছে।

এই বীরভূম জেলার অন্তর্গত বক্রেশ্বর এক উন্নত তীর্থক্ষেত্র রূপে এ যুগে বিরাজ করিতেছে। তথায় দেবালয়ের মধ্যে অষ্টাবক্রমুনি এবং তৎপার্শ্বে বক্রনাথের শিবলিঙ্গ পূজিত হইতেছেন। এস্থানে তীর্থ বক্রেশ্বর, আরাধ্য দেবতা বক্রেশ্বর, নদী বক্রেশ্বর —সকলেই একনামে খ্যাত ও আহূত হইতেছেন। এতদ্ভিন্ন ভারতের অপর কোন স্থান এইরূপে পরিচিত নহে। এইরূপ স্থানগৌরব লোকসমাজে ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল না। মূলে সত্য প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, যুগযুগান্তের পরিবর্তনে সকলই লোপ পাইয়া যাইত, কিন্তু কালের কবলে সত্য কখনও লুপ্ত হয় না এবং বক্রনাথ যে অধিষ্ঠিত দেবতা এবং অষ্টাবক্রমুনি যে তপস্বীর তপোধন, তাহা এখনো জগতে ঘোষিত হইতেছে। তাহা যে সত্য, ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয়।

সর্বভারতের মধ্যে যেরূপ যোগ ছিল তদ্রূপ যোগ বাঙ্গালার সহিত মিথিলার ছিল। মহামুনি অষ্টাবক্র বাঙ্গলার এই তীর্থে উচ্চ তপস্যায় রত ছিলেন। বাঙ্গলার বাহিরে দ্বারবঙ্গ (অধুনা দ্বারভাঙ্গা) নাম এখন প্রচলিত আছে।

মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক বিভিন্ন সময়ে সৎমিলনের আকাঙ্ক্ষায় ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তপোরত মুনি, তপস্বী, যতী ব্রতী, ত্যাগী মুক্ত পুরুষগণের সান্নিধ্য-লাভে নিজে সুখী হইতেন এবং যথোপযোগী সমাদর এবং দ্রব্য সম্ভার দানে তাঁহাদেরও পরিতৃপ্ত করিতেন। এই সুধীজন মিলন আকাঙ্ক্ষার ঐতিহ্য অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

মহামুনি অষ্টাবক্র বাঙ্গলার এক শ্রেষ্ঠ তীর্থে বর্তমান ছিলেন এবং এস্থানে

তাঁহার কোনো আমন্ত্রণ আসিলে অবসর বুঝিলে তথায় যাইতেন। যে-যুগে বিদেহ রাজ মুনিসমাবেশ আমন্ত্রণ দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন, সেই সময় অষ্টাবক্র মুনি বাঙ্গলা হইতে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিয়া তথায় মহাপুরুষগণের সহিত সংযোগ স্থাপনে পরস্পর আনন্দ অনুভব করেন।

এইরূপ মিলনে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক মহামুনি অষ্টাবক্রের তপোধন সত্যজ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের উভয়ের মিলনে যে বিরাট সত্য প্রকাশিত হয় তাহাই 'অষ্টাবক্র সংহিতা' নামে খ্যাত হইয়াছে।

এক আখ্যায়িকায় এইরূপ উল্লেখ আছে যে মহাযোগী কঠোরব্রতী পরমকারুণিক মহর্ষি উদ্দালক সশিষ্য আশ্রমবাসী ছিলেন। তৎপুত্র ব্রহ্মজ্ঞ উচ্চাদর্শী স্নেহপ্রবণ শ্বেতকেতু পিতৃ সান্নিধ্যলাভে বরেণ্য হইয়াছিলেন। কহোড় মুনি উদ্দালকের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরুর সর্বভাবে সেবাপরায়ণ হওয়ায় এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করায় তিনি গুরুর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শাস্ত্র ও উচ্চজ্ঞানের আধার দেখিয়া গুরু নিজ কন্যা সুজাতাকে কহোড় মুনিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সুজাতার গর্ভে মহর্ষি অষ্টাবক্রের জন্ম হয়।

এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহর্ষি কহোড় সমস্ত রাত্রি শিষ্যগণবেষ্টিত হইয়া শাস্ত্রালাপ করিতেন। পূর্বসংস্কারবদ্ধ থাকায় অষ্টাবক্র মাতার গর্ভে থাকা কালেই পিতার শাস্ত্রালোচনা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, মাতা সুজাতার গর্ভে থাকাকালীন অষ্টাবক্র একদা তাঁহার পিতার শাস্ত্রালাপের ভ্রান্তি ধরিয়া দিয়াছিলেন। শিষ্যগণ সম্মুখে থাকায় পিতা কহোড় গর্ভমধ্যস্থ পুত্রের ধৃষ্টতাসূচক বাক্যে অপমানিত বোধ করেন। ফলত তিনি পুত্রকে অভিশাপ দেন—"তোমার অষ্ট অঙ্গ বক্র হইবে।"

কিছুকাল পরে সুজাতা মুনিবর কহোড়কে বলিলেন, "উপস্থিত আমার পূর্ণ গর্ভাবস্থা, এই সময় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে অনেক সুবিধা হয়।"

মহামুনি সহধর্মিণীর কথানুসারে মিথিলাধিপতি জনক রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজসভাপণ্ডিত বন্দী বিশেষজ্ঞ বিচার কুশল ছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কহোড় তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে পরাস্ত হইয়া পূর্ববাক্য অনুযায়ী ডুবিয়া আত্মঘাতী হইলেন।

যথা সময়ে সুজাতার গর্ভে অষ্ট অঙ্গ বক্র অবস্থায় পুত্রের জন্ম হইল। মহর্ষি উদ্দালক নিজ কন্যাকে তাঁহার জামাতার সকল ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "রাজ সভাপণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হইয়া তিনি জলে নিমগ্ন হইয়াছেন। একথা তুমি কদাপি পুত্রের সম্মুখে প্রকাশ করিও না।

তৎপরে মুনিবর অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালককে পিতা এবং মাতুল শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা জ্ঞান করিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কালাতিপাতের পর একদা অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালকের ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন এরূপ অবস্থায় মাতুল শ্বেতকেতু নিজপিতার ক্রোড় হইতে অষ্টাবক্রমুনিকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ইহা তোমার পিতার ক্রোড় নহে।"

এই নিদারুণ বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া অষ্টাবক্র মাতার নিকট নিজ পিতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। মাতা সুজাতা পুত্রের বাক্যে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন কিন্তু সত্য প্রকাশে বিরত থাকিলে পুত্র ক্রুদ্ধ হইবে এই ভাবনায় ভীত হইয়া বলিলেন "রাজর্ষি জনকের সভাপণ্ডিত বন্দীর নিকট তোমার পিতা শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইয়া জলে নিমজ্জিত হইয়াছেন।"

এই বাক্য শুনিয়া অষ্টাবক্রমুনি বলিলেন, "আগামী কালই আমি মিথিলাধিপতি জনক রাজার যজ্ঞস্থল দর্শনে যাইব।"

অষ্টাবক্রের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার মাতুল শ্বেতকেতুও তাঁহার সঙ্গে জনক-রাজার যজ্ঞস্থল দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

পরদিন শ্বেতকেতু এবং অষ্টাবক্র জনকরাজসভায় যজ্ঞদর্শনে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে দ্বারী সেই অল্পবয়স্ক বালককে যজ্ঞক্ষেত্রে যাইতে অনুমতি দিল না। এইরূপে যজ্ঞদর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মাতুলসহ অষ্টাবক্র জনক রাজার সন্দর্শনে গেলেন।

অষ্টাবক্র বালক হইলেও তাঁহার বাক্যে অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভা দর্শন করিয়া রাজর্ষি জনক তাঁহাকে যজ্ঞ দর্শনে যাইবার অনুমতি দান করিলেন।

যজ্ঞস্থলে গিয়া অষ্টাবক্র রাজপণ্ডিত বন্দীর সহিত শাস্ত্রবিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন।

রাজপণ্ডিত বন্দী বরুণ দেবের পুত্র ছিলেন। বরুণদেব জলমধ্যে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তথায় সুপণ্ডিত শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-সম্পাদনে প্রয়োজন হইবে। সেই প্রয়োজনসাধনে তাঁহার পুত্র বন্দী জনক রাজার সভায় কর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পণ ছিল, শাস্ত্রবিচারে যাঁহারা তাঁহার নিকট পরাস্ত হইবেন, তাঁহাদের জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে পরাভূত পণ্ডিতগণকে জলমধ্যস্থ বরুণ দেবের যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি পাঠাইতেছিলেন। এই ভাবে তথাকার যজ্ঞকার্য চলিতেছিল। বরুণদেব যাজ্ঞিক হোতাগণকে প্রভূত ধনসম্পদদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ পরে বন্দী অষ্টাবক্রের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া নিজে জলমধ্যে বরুণদেবের নিকট চলিয়া যান এবং কহোড় মুনি তথা হইতে মুক্ত হইয়া জনক রাজার সভাস্থলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। কহোড়মুনি তথায় শ্বেতকেতু এবং পুত্র অষ্টাবক্রের পরিচয় পাইয়া সানন্দে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরে সকলে একত্রে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জনক রাজা তাঁহাদের বহুদ্রব্যসম্ভারে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। মিলনক্ষেত্রে পিতার আদেশে মধুবিলা নদীতে স্নান করায় অষ্টাবক্রের অঙ্গ সম হয়। পতি বিরহ কাতরা এবং বিদেশগত পুত্রের সহিত মাতা সুজাতা মিলিত হইয়া পরম আনন্দিতা হইলেন।

অপর এক আখ্যানে প্রকাশ আছে, এক সময়ে জনক রাজা মুনিগণের এক সভা আহ্বান করেন। তথায় অষ্টাবক্র মুনি উপস্থিত ছিলেন। ধর্মসভায় যাইবার সময় রাজা জনক অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন। সভার বহির্ভাগে জনক রাজার সহিত অষ্টাবক্রের সাক্ষাৎ হয়। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিতেছিলেন, এমন অবস্থায় রাজা অষ্টাবক্রের কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, তিনি রাজাকে বলিলেন, "প্রথমে আমাকে দক্ষিণা দান করিতে হইবে পরে কৃপা পাইতে পারেন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নিকট কৃপা পাইবার পূর্বেই কি দক্ষিণা দান দিতে হইবে?"

অষ্টাবক্রমুনি বলিলেন "পূর্বে দিতে হইবে এই কারণে যে করুণালাভের পর আপনার বাহ্যসংজ্ঞাবোধ থাকিবে না।"

রাজা কহিলেন, "কি দিতে হইবে আদেশ করুন।" মুনি বলিলেন, "তনু মন ও ধন দিতে হইবে।"

রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

তখন অষ্টাবক্র জনক রাজাকে মন্ত্রদান করিবামাত্র রাজা সংজ্ঞাহীন হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। তাঁহার এক হস্তে অশ্বরজ্জু এবং তাঁহার এক পদ ভূমিতে ও আর এক পদ অশ্বের রেকাবে রহিয়া যায়। ঐরূপ অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর অষ্টাবক্রের স্পর্শে পুনরায় রাজার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। কথিত আছে এইরূপে জনক রাজাকে অষ্টাবক্র দীক্ষাদান করিয়াছিলেন।

অষ্টাবক্রমুনির কয়েকটি বাণী লিখিত হইল :—জীব দেহ ধারণ করিয়াছে কর্ম করিতে। স্বপ্রবৃত্তি অনুযায়ী মনুষ্য ধর্মাচরণ করিয়া থাকে। ধর্মার্থে দেহ ধারণ যাঁহার মনের প্রবৃত্তি, তিনি তদনুরূপ কর্ম করিয়া প্রকৃত সৎপুরুষ হইতে পারেন।

নিজ জীবনে সৎধর্ম পালন করিয়া তিনি উন্নত অবস্থা লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। ধর্ম আশ্রয় করিলে তাঁহার এইরূপ আকর্ষণ ক্রমে সৎ-এ আসক্তি বৃদ্ধি করিয়া আত্মসাধন কর্মানুরাগ তাঁহাকে উত্তরোত্তর লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেয়। দিনে দিনে তাহা পরিপক্বতা লাভের পথে তাঁহাকে লইয়া যায়।

কর্মে আসক্তি ধর্মে অনুরাগ সৎপুরুষের একমাত্র মজ্জাগত প্রবৃত্তি হইলে সেই মানবকে সদানুষ্ঠানে প্রকৃতি ব্রতী করিয়া রাখে। এইরূপ সুগঠিত উত্তম স্বভাব মনুষ্যকে এক উজ্জ্বলতর উন্নতলোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে উচ্চ আনন্দময় ধামে লইয়া যাইবার সুযোগ দান করে। কর্মব্রতী যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি সৎসংযোগে ধ্রুব সত্যের আকর্ষণে অবিচলিত চিত্তে অনাড়ম্বরে যে-সাধনব্রত অবলম্বন করিয়া একাগ্রচিত্তে স্বকর্ম পালন করে নীরব সাধকের তাহাই বল, আত্মকর্মের সঞ্চিত সাধনার স্তূপীকৃত সুকর্মরাশির তাহাই ফলশ্রুতি। বাহিরে লক্ষ্য করিবার তাঁহার কিছু থাকে না। অন্তর্দৃষ্টি স্থির আত্মব্রতী সৎপুরুষ নিজ সাধনায় নিবিষ্ট থাকেন বলিয়া বহিরালাপে অমনোযোগী অন্তরে চিত্তবৃত্তি তাঁহার বদ্ধ ও রুদ্ধ থাকে। ফলে সৎপুরুষেরা সর্বদা প্রফুল্ল বদনে স্বকর্ম সাধন করিয়া যান। ভোগবিলাসে নিবৃত্ত থাকিয়া স্বর্গীয় অনুপম সুখে সর্বদা তাঁহারা স্নাত ও স্নিগ্ধ। উচ্চাঙ্গের অমৃতাস্বাদে সর্বদা তৃপ্ত। দিবারাত্র এক ধ্যানে এক যোগে যুক্ত অবিরল সুধা রসধারায় মুগ্ধ হইয়া যোগী বাহ্যমুক্ত অবস্থায় নিজ সিদ্ধ আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

কর্মের বিরতি নাই। কালের বিভাগ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার নাই। বর্ণের রেখার গণ্ডিতে সমাজের একপক্ষাবলম্বনের শৃঙ্খল নাই। আপন বা নিকট দূর বা পর বলিতে কেহই নাই। উচ্চনীচ দূষিত কলুষিত ভেদ-বুদ্ধির রোষ কটাক্ষের শাসন, কায়া বা ছায়ার স্পর্শ দোষ, সম আসনের অধিকার ভেদ, জীবনদাতার সম্মুখে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশের বাধা, রুদ্ধ অন্তরের ভাবোল্লাস অশ্রু বর্ষণে নিষেধ, এখানে কোনো অবরোধই নাই। শুধু সেই চিন্ময়ধাম পাষাণ দেবতার আরাধনা। শুধু ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে পরমারাধ্যের সদাচিন্তনে সদাশিবের আশিস লাভের আকাঙ্ক্ষা। অন্তরের অন্তস্তল হইতে নির্ঝরিণী ধারায় প্রেমবারি স্নাত হইয়া অক্লেশে সীমা উত্তীর্ণ হওয়া অথবা পাপ পঙ্কিল মালিন্যের সকল আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া রিপুদোষ বর্জিত হওয়াই সেই ত্রিকাল ত্রিগুণের অতীত যিনি, তাঁহার কৃপাকণা লাভের লক্ষণ। তাই ইন্দ্রিয় ভোগমুক্ত শুদ্ধ আধারে ত্রিকাল ত্রিগুণের অতীত যিনি, তাঁহার কৃপাকণালাভে পবিত্র সর্বগুণাধার সর্বগুণালঙ্কৃত নামের আশ্রয় লাভ করিলে এমন কি দীনহীন ব্যক্তি

যিনি সহস্র কমলোপরি আসীন, তাঁহাকে নতশিরে সমআসনের অধিকারী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন।

কে পর, কে নিকট, কে দূর, কে অপরিচিত—সে বিচারের সময় নাই। কাল অবিরত ধারায় নিজ রেখায় ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে। সে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। অন্তরের ক্রোড়ে পলে পলে বহুর অলক্ষ্যে অসীমে লীন হইতেছে। কাল আসিতেছে। দিবারাত্র ভেদে সর্বসমক্ষে নীরবে বিচরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাহ্য কর্মব্যস্ত সংসারী জীব আত্মপোষণে সেই কাল কাটাইতেছে। দেহপাত করিয়া কুটুম্বভরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। উত্থান পতনের জরা মৃত্যু জন্মের বিভীষিকায় আন্তর-বাহ্য-ক্লিষ্ট হইয়া ঘাত প্রতিঘাতের শত যাতনায় বিড়ম্বিত হইয়া, জীবনদেবতাকে বিস্মৃত হইয়া সর্বগ্রাসী কালের ক্রোড়ে শায়িত হইতেছে।

মনুষ্যের মাতৃগর্ভে জন্ম হইয়াছে, মাতৃক্রোড়ে স্নেহের পুত্তলি হইয়া কত আদরে লালিত পালিত হইয়াছে। যে-ব্যক্তির যথাসাধ্য দুঃখ দূর করিতে পিতা মাতা কাতর হয় নাই সেই মানব, যিনি সর্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা জগৎবিধাতা তাঁহার পরিচয় না লইয়া, পথভ্রষ্ট পতিতজনের ন্যায় সাময়িক সুখভোগ লালসা বিসর্জন দিতে বিমুখী হইয়া ত্রিতাপদগ্ধ সংসারসাগরে আত্মপরিজন বেষ্টিত হইয়া অন্ধের ন্যায় বিচরণ করে।

কর্ম লইয়া মনুষ্য আসিয়াছে। কাহার কি কর্ম, প্রবৃত্তি অনুযায়ী সংস্কার-বশে স্বভাবশত সে তৎকার্যে অনুরাগী হইয়া সাধন করিতেছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যদি সৎকর্মে মন আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে জীবনের সৎসাধনা আরম্ভ হয়। যদি তাহাতে মনোনিবিষ্ট থাকে তাহা হইলে একাগ্র কর্মব্রতীর ফল উত্তরোত্তর উর্ধ্বমুখী করিয়া লইয়া যায়। সৎ-এ যাহার প্রীতি জন্মিয়াছে সে ফলাফলের অভিলাষ করে না। জীবনের একমাত্র আরাধ্য যিনি, তাঁহারই স্মরণে ক্রমে ক্রমে অন্তরে সে গভীর হইতে গভীরতম প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে। সৎ পদাশ্রয়ে চিরন্তন সত্যের আলোকে সে দীপ্ত হইয়া উঠে। সমুজ্জ্বল জ্ঞানরাশিতে সে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। একানন্দের কাল অকাল ভেদচিন্তা মুক্তাবস্থায় বিরাট বিশালের সে মধু রসাস্বাদনে মগ্ন থাকে।

বহুরূপে দ্বৈতভাবে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গুণাধারে সসীমে বহু স্তবস্তুতি অর্চনায় আরাধিত ফলফুল মাল্যসম্ভারে নৈবেদ্যের অর্ঘদানে যিনি পূজিত, সেই পরমারাধ্য পরমদেবতা হৃদয়ের ভক্তিরসে সিঞ্চিত পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা অন্তরের অন্তস্তল হইতে আগত শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভে তৃপ্ত হন।

তপস্বী একভাবে একরূপে পূজা বন্দনা করিতে করিতে পূজার্থে দেবতাকে তৃপ্ত করিয়া পরে মন স্থির করেন। বিভিন্ন দ্রব্যের সংগ্রহে চঞ্চল না হইয়া আড়ম্বর বর্জিত একের চিন্তনে কাল কাটাইয়া সসীম হইতে অসীমে, দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে, বহুরূপ হইতে একে, সাকার হইতে নিরাকারে, সগুণ হইতে নির্গুণে, সুবিকল্প হইতে নির্বিকল্পে ধীরে ধীরে তদবস্থায় উপস্থিত হয়। রূপ-ভেদে, গুণভেদে, প্রকৃতি পুরুষ আধারভেদে সাধক কর্তৃক আরাধিত হয়। তজ্জন্য কেহ নিন্দিত বা শ্রেষ্ঠত্বে-পূজিত নহেন। অবস্থা ভেদে মানসিক ক্রম বিকাশে যে যে অবস্থায় যাইতেছে তাহাই তাহার উৎকর্ষ অবস্থা। কর্মনিষ্ঠায় থাকিয়া যে-সত্যের প্রকাশ অন্তরে উদিত হয় তদনুযায়ী কার্য করিলে কেহ নিন্দিত হইবে না। সত্যগ্রাহী হইয়া সত্যের সন্ধানে বহু বা দ্বৈত বাদ হইতে এক বা অদ্বৈতের জ্ঞানে মগ্ন থাকিলে কেহ ঘৃণিত নহেন। কারণ সেই সাধক সকল অবস্থায় বিচরণ করিয়াছে যে কোনো অবস্থাকে নিন্দা করে না।

চরম সাধনায় কোন্-স্থানে যাইয়া মনুষ্য কি ফল লাভ করিয়া এক-বদ্ধ অবস্থায় কাহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া কোন্ অনির্বচনীয় সুখাস্বাদে নিমজ্জিত থাকে তাহা অপরে কি বিচার করিবে! বহিরঙ্গের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া এক ধ্যানে যুক্ত থাকাই একমাত্র কর্ম যোগীর সাধনা। যোগী বাহিরে উঠিয়া কোনো কর্ম করিতে অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন। তিনি বাক্যালাপে সঙ্কুচিত হন। তিনি পরের বৃথা চিন্তায় বিপন্ন হন। সেই প্রেমিক একনিষ্ঠ ধর্মবীর উচ্চাঙ্গ মিলন যোগে পরমানন্দের মধুর রসাস্বাদনে বিহ্বল হইয়া গভীরতম অবস্থায় সর্বদা সত্যে বিরাজ করেন। তাঁহার মন যাঁহাকে চাহিয়া তুষ্ট, তিনি তাঁহার আরাধনায় আত্মপর ভুলিয়া সদানন্দে সৎচিন্তনে দিবারাত্র সমজ্ঞানে সম অবস্থায় থাকেন। যিনি সর্ব জীবের আরাধ্য, সর্বচিত্তাকর্ষী তাঁহাকেই মন-প্রাণ বিসর্জন দিয়া তিনি আত্ম সমর্পণের সুখাস্বাদ করেন।

যোগসাধনার পরিণতি কোথায়—যোগাচার্য প্রথমে ইহা বিচার করিতে বা ধারণার মধ্যে আনয়ন করিতে পারে নাই। কর্ম করিতে হইবে, সংস্কারবদ্ধ অবস্থায় ইহাই সঙ্কল্পিত রহিয়াছে। এ জন্মে যতদূর সম্ভব কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, পুনরায় অবশিষ্ট কার্য কৃতীজনের পরজন্ম গ্রহণ করার পর হইতে বিভিন্ন বিষয়ে, ভাষায় ও কার্যাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয়। স্থির দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিলে এক ব্যক্তির আচরণে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারা যায়। কর্মে আসক্তি ধর্মে রতি এই সকল কর্মাচরণে তাহা কিছু কিছু প্রকাশ পায়। সেই ব্যক্তি নিজ জীবনের সংস্কারবদ্ধ কর্ম

স্বাভাবিক ভাবে করিয়া যায়। সুমতি কুপ্রবৃত্তি আপনি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করে এবং সেই মানব তদাচরণে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাধন করে। কর্ম মধ্যে কোন্ কার্য কালোপযোগী ইহা বিচার করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না। নিজ জীবনের ধারা স্বাভাবিক ভাবে তাহাকে যেদিকে লইয়া যায় তাহার কর্ম তৎমুখী হয়। তবে কালের প্রভাব, মহাজনের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না, তাহা নহে। কেহ বাহ্য কর্ম মুক্ত হইয়া অন্তর্নিবিষ্ট অবস্থায় সর্বত্যাগী উদাসী হইয়া আত্মভজনে লোকালয় হইতে দূরে গিয়া একান্তে ধর্ম সাধনে যুক্ত রহেন। আবার কেহ লোক সমাজে থাকিয়া দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

কে উন্নত কে অনুন্নত এ বিচারের প্রয়োজন নাই। যে যে স্থানে থাকিয়া আত্মোন্নতি ধর্ম আশ্রয় করিয়া আত্মহিতে যুক্ত অথবা জনকল্যাণ কর্মে দশের মঙ্গলে ব্রতী তাঁহারা প্রত্যেকে কর্মরত ব্যক্তি মহোন্নত উদার আত্মগণ্ডির মধ্যে যুক্ত থাকিয়া স্বকর্ম সাধন করেন।

যে কর্মযোগী সর্বত্যাগী উদাসী হইয়া কেবলমাত্র একধ্যানে একমন হইয়া সাধনে বদ্ধাবস্থায় যুক্ত থাকেন, তাঁহার আনন্দ রসাস্বাদন কীরূপে ঘনীভূত হয় তাহা উত্তরোত্তর অসীম সুখস্বাদে তাঁহাকে কীভাবে মগ্ন রাখে, সে একমাত্র একনিষ্ঠ সৎপুরুষ ব্যতীত অপরের পক্ষে অবশ্যই দুরধিগম্য। বাহ্যে নির্লিপ্ত ও মুক্ত স্বচ্ছহৃদয়ে সরলপন্থায় চলিয়া আত্মহারা সেই গুণধর যোগীবর সকল ইন্দ্রিয় আয়ত্তাধীনে রাখিয়া পরমানন্দ লোকে বিচরণ করেন।

সেই কালপুরুষ মহাকালের সহচর হইয়া, নিত্যকাল কুক্ষিগত করিয়া সদাচেতন সদানন্দে উদ্বুদ্ধ ক্ষুৎতৃষ্ণা বিবর্জিত জরামরণ, ব্যাধি দূরে স্থিত, প্রতিপল প্রতিক্ষণ কাহার স্মরণে যুক্ত, সেই চিদানন্দ সাধনব্রতী তাহা একমাত্র অবগত থাকেন। কালের সহগামী হওয়ায় দিবারাত্রের চৈতন্যহারা সেই বাহ্যবোধ বিস্মৃত মহাজন কোন অনির্বচনীয় চিৎঘন ভূমানন্দে আত্মলুপ্ত অবস্থায় কূটস্থ হইয়া তুরীয়ানন্দে স্থির ধীর সসীমের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া অব্যক্ত অসীমে লীন হইয়া থাকেন। সেই মহাযোগাবস্থায় কতকাল যাইতেছে সে নির্ণয় কে করিবে? যে অবস্থায় দিবসের গণনা নাই, শ্বাস প্রশ্বাসের স্থিরতা নাই, কাল অকালের নির্ণয় নাই, সুখ দুঃখের বিচার নাই, বাহ্যানুভূতির লেশ নাই, সেই মহাধ্যানী মহাযোগী কল্পাতীত অবস্থায় বিরাজ করেন।

দত্তাত্রেয় স্বামী

এই স্থানে দত্তাত্রেয় স্বামীর চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে। গুজরাট অঞ্চলে গির্নার পর্বতে তিনি কঠিনতম তপস্যা করিয়া যে-সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা "দত্তাত্রেয় সংহিতা" গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ ভিত্তির উপর লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে, মুনিবর গিরনার পর্বতে পূর্বাস্থ দণ্ডায়মান হইয়া দ্বাদশ বর্ষ তপশ্চরণে ছিলেন।

এ ক্ষেত্রে শিব চৈতন্য ব্রহ্মচারী ১২৯৫ সালে দেবাদিষ্ট হইয়া দত্তাত্রেয় চরণ-চিহ্ন এক নব নির্মিত মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। বটুক ভৈরব মন্দিরের দক্ষিণাংশে এই দেবালয় রহিয়াছে। দত্তাত্রেয় স্বামী সাধনপথে অবতীর্ণ হইয়া সত্যের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করিলেন। মনুষ্য পশু পক্ষী যাহার নিকট কর্ম বা আচরণে বিভিন্ন সময়ে যে-সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া সেই ভিত্তির উপর নিজ চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি চব্বিশটি গুরু করেন।

তাঁহার তিন শির ছিল ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁহাতে এই ত্রিশক্তির সমাবেশ ঘটে। একাধারে সত্ত্ব-রজ-তম এই তিন গুণের সাম্য অবস্থায় আবার কখনো ত্রিগুণাতীত অবস্থায় স্থিত হইয়া তিনি পরম সত্যে বিরাজ করিতেন। তিনি এক অদ্বিতীয় অনন্ত অখণ্ড নির্গুণ ব্রহ্ম—এই জ্ঞান চরমাবস্থায় উপলব্ধি করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। সৃষ্ট জীবরূপের মধ্য দিয়া তিনি অরূপ নিরাকার ব্রহ্মের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। যিনি 'সঃ' সাকার গুণের মধ্য দিয়া সাধন দ্বারা তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া, অসীমে বিরাজ করিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি সীমার মধ্য দিয়া অসীমে, সগুণের মধ্য দিয়া গুণাতীত নির্গুণে, এক এক রূপে বহু হইতে সঞ্চয় করিয়া অদ্বৈতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যকর্ম সংযত ভাবে সাধন করিয়া অতীন্দ্রিয় অবস্থায় সূক্ষ্ম যোগে বিভুর ধ্যানে দৈবৈশ্বর্য বিভূতি তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

দত্তাত্রেয় স্বামীর উক্তি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিত হইল :—

স্বকর্ম সৎ সাধন দ্বারা জীবন ধন্য করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। জীবনে যাহার যেরূপ অবসর পাইবার সুযোগ আসিতেছে সে সেইরূপ কর্মসাধনে মনোযোগ দিলে

বৃথা কালক্ষেপে অলস বা অকর্মন্যভাবে সময় কাটাইয়া সে অপরাধী হয় না। কর্তব্য কর্ম হইতে বিচ্যুত হইলে মানব দোষী হয়। কার্য হইতে স্খলন বা শৈথিল্যে আপনাকে অসহায় অবস্থায় রাখা অথবা সুযোগ থাকিতেও কর্মে অবহেলা অপরাধ। সংসারে থাকিয়া ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া সামাজিক বন্ধনে যথাকর্তব্য পালন করা এবং দেবার্চনাদি সৎকর্ম আচরণ করা মনুষ্যের বিধেয়। এই জীবনে সৎধর্ম রক্ষা করিয়া, যথাশক্তি বৈধকার্য, সত্যনিষ্ঠার সহিত যাহা আচরিত হয়—তাহাই স্বোপার্জিত ধনসম্পদ। যতকাল মানুষ জীবিত থাকে ততকাল তাহার সেইসব কর্মের সংযোগে যথাসম্ভব যুক্ত থাকিয়া, মনকে সর্বদা সত্যে বদ্ধ রাখিয়া ধর্মভাব রক্ষা করাই ইহকাল বা ইহলোকের বৈধ ক্রিয়া।

কঠোর কর্মান্তে যেরূপ অবসাদ আসে এবং সেজন্য যেরূপ অবসর প্রয়োজন তদ্রূপ ইহজীবনে প্রথমে বৈধ কার্যান্তে একভাগে সাধন সমাপ্ত হয়, পরে একাসনে এক ধ্যানে স্থিত, নির্জনে নীরবে একে যুক্ত থাকিবার সুযোগ লইবার অবস্থা আসে। তখন বাহ্য বৈধকর্ম প্রায় সকলই কমিয়া বা ক্ষয় হইয়া যায়। সে অবস্থায় পরিপক্কতা লাভের জন্য উন্নত সাধনে একাসনে দীর্ঘকাল কাটাইবার সুযোগ গ্রহণ করাই নিজ সৌভাগ্যের উদয়। পরিণামে একান্তে নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া সত্য ধ্যানে যে-যুক্ত থাকা তাহাই বিকার মুক্ত। মনের বিবিধ বৃত্তি শূন্য করিয়া, এক যোগে যুক্ত থাকিয়া, অসীম অনন্তের প্রেমবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, বিভুপ্রেমে অপার আনন্দে মুক্ত থাকাই জীবনবেদধর্ম। এরূপ অবস্থায় তিনি জ্ঞাত পরিচিত নিকট আনন্দ-ঘন-নিবিড়-বন্ধনে হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে প্রেম পরিণয়ে চিরতরে জন্ম জন্মান্তের আরাধ্য হইয়া বিরাজ করেন। ইহাই পরকাল বা পরলোকে পরাশক্তির প্রণয় বন্ধন।

দত্তাত্রেয় স্বামী বলেন, বর্তমানকে প্রাধান্য দিয়া, কর্মের দ্বারাই সেই ভিত্তিকে দৃঢ় করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নত করিবার একমাত্র সুযোগ ও পন্থা। জীবনের এক অবস্থাকে অবহেলা করিয়া পরের অবস্থা উন্নত হউক এরূপ চিন্তাযুক্ত অলস নিষ্কর্মা অমনোযোগী পুরুষের জীবন কদাপি সুখময় অথবা সফলকাম হইতে পারে না। কালের প্রতিক্ষণে যাহার লক্ষ্য আছে সেই ব্যক্তি উচ্চাবস্থালাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

কালকে আশ্রয় করিয়া জীব দিনাতিপাত করে, তাহাই জীবনের কর্মকে বিভক্ত করে বা নির্দিষ্ট সংখ্যার বা পরিমাণের মধ্যে রক্ষা করে; তদ্রূপ ত্রিগুণ সত্ত্ব-রজ-তম যাঁহার অধীনে বা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টজগৎ রহিয়াছে, কি জড় কি প্রাণবান সকলেই ইঁহার অধীনে থাকে। সেই ত্রিগুণ নিজে আয়ত্ত

করিতে পারিলে একের প্রাধান্যে অপরের গুণের বশীভূত হইতে হয় না। সাধনার দ্বারা এই ত্রিগুণকে সাম্য করিতে হয়। মানব যে-পর্যন্ত ত্রিগুণাধীন হইয়া থাকে ততক্ষণ তাহার চঞ্চলমন সেই শান্ত আনন্দময়ের কোনরূপ অনুভূতি লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না।

ত্রিগুণের চাঞ্চল্যে ছয় রিপু বিভিন্ন গুণাধীন হইয়া এক এক অবস্থায় প্রবল হইয়া প্রকাশিত হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছয় রিপুই মানবকে প্রথমাবধি বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করে। সাধন দ্বারা মানুষ ইহাদের বশ্যতাপ্রাপ্ত বা ইহাদের মন্দ গতি রোধ করিবার যোগ্যতা লাভে উপযোগী হয়।

কর্ম দ্বিবিধ,—সকাম ও নিষ্কাম। মনুষ্যের বাসনা থাকায় জন্ম হইয়াছে, তাহারই পরিপূর্ণার্থে পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী কর্ম প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রবৃত্তি অনুযায়ী যে-কর্মযোগে যুক্ত হওয়া যায় তাহা বাসনা কামনা সম্পন্ন করিবার জন্য। এই কর্মেচ্ছা মনুষ্যকে স্বাভাবিক গতিতে সু বা কু কামনা সিদ্ধ করিতে অগ্রসর করে। যাহার সৎ বাসনা রহিয়াছে সে আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া সুপথগামী হয়। যে-বাহ্য সুখসম্ভোগের লালসায় বদ্ধ হইয়া কার্যে রত আছে, সেই নিজেকে আরো ভ্রান্ত সুখাশায় লিপ্ত করিয়া তমসাচ্ছন্ন ঘোরান্ধকারে পতিত করে। সাধন দ্বারা পূর্বকর্ম ক্ষয় করা এবং উন্নত সুপথ আশ্রয় করিয়া জীবনের গভীরতম আনন্দরসে মগ্ন থাকিবার সুযোগ মনুষ্য গ্রহণ করে। বাস্তব বাহ্যের আসক্তি বন্ধনের কারণ হয়। সকাম পুরুষ পার্থিব জগতের বিষয়সম্পদ বা সম্ভোগ লাভ করিয়া তাহা দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করে। এই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার প্রবৃত্তি ও প্রয়াস নিবৃত্তি মার্গে যাইবার সুযোগ দান করে। বাহ্যসুখ বহিরিন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য জ্ঞান। আত্মজ্ঞান দ্বারা কুপ্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া মানুষ অন্তরিন্দ্রিয়ে মনঃসংযোগ করে। স্থির চিন্তনে একাগ্র সংবন্ধনে নিষ্ঠার সহিত যুক্ত থাকাই সংযত মনে সূক্ষ্মানুভূতি লাভে অবসর দান করে। এরূপ অবস্থায় বাহ্য সকল কর্মই অবসান হয়, বাহ্য চাঞ্চল্য স্থির হয়, অন্তরের গভীর আনন্দ সুখময় রসাস্বাদনে সাধককে নিমগ্ন রাখে। নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া সকল বাহ্যকর্ম ও বিবিধ বাসনাকে সংযত বা বর্জন করিয়া এক অসীম সুখানন্দে কর্মব্রতী মগ্ন হয়। ইহ-কাল বা ইহলোক বর্তমান, পরকাল বা পরলোক ভবিষ্যৎ—এই দুই কালকে দত্তাত্রেয়স্বামী বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। সুতরাং উপস্থিত এই বর্তমান। এই সময়ে যিনি নিজ কর্তব্য কার্যে নিষ্ঠা রাখিবেন, তিনিই

ধর্মদ্রুত পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পান। বর্তমান কালকে অবহেলা করিলে কর্মহীন অবস্থায় মনুষ্য জড়বৎ হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়। বর্তমানে যতটুকু বা যাহা করিব তাহাই নিজ সঞ্চয় রহিল। পরিণামে তাহারই সঞ্চিত ফল আস্বাদ করিবার বা সুফল ভোগ করিবার সুযোগ আসে। এক-নিষ্ঠ কর্মদ্বারা বহু লাভ হয় ও সৎপথে বহুদূর অগ্রসর হওয়া যায়। যে যত বর্তমান কালের সংব্যবহার করিতেছে সেই নিজ ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের অধিকারী হইতেছে। কার্য বা সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া একান্ত মনোযোগ দানে যে-কর্ম করা যায় তাহা প্রতি পলে পলে আলোক দেখাইয়া ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া জীবন উচ্চতর আদর্শে উন্নত করে।

সাধনযুক্ত সৎপুরুষ এক সত্তা আশ্রয় করিয়া, ধীর আসনে আত্মযোগে উপবিষ্ট থাকে এবং সাধনার দ্বারা বর্তমান কালকে নিমেষের জন্য অলক্ষ্যে যাইতে সে অবসর দেয় না। অর্থাৎ সৎ সৎযোগে থাকিয়া যথাসাধ্য সময়ের সু-ব্যবহার করিয়া ভবিষ্যতের বা পরকালের আগত কালের জন্য সংশক্তি সঞ্চয় করে। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ কঠোর সাধনার দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহাই ভবিষ্যৎ জীবনে মূলধন বা সুউচ্চ আদর্শে সুগঠিত জীবন। এক মনে এক ধ্যানে এক যোগে দৃঢ় আসনে উপবিষ্ট হইয়া সৎ যোগে যে-কর্ম বর্তমানে সাধিত হয় তাহাই পরকালে ভবিষ্যতে অপূর্ব শক্তিদান করে। প্রতিপলে প্রতিক্ষণে ধীরে ধীরে প্রতিশ্বাসে যাহা আগত বা সঞ্চিত হইতেছে তাহাই জীবনের পরকালের পরলোকের রক্ষিত বিপুল সম্পদ। বর্তমানে আজ যাহা সঞ্চিত হইল, দিনে দিনে কর্মরত সাধক অনন্য স্মরণে যে-ধ্যান দ্বারা জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হয় তাহাই পরকালে তাহাকে অধিক শক্তিদান করিয়া প্রতিপদে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়।

মনুষ্যকে লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে হইবে। দূর আদর্শকে নিকট অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। বর্তমানকে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া উচ্চানন্দ লাভের উপযোগী হইতে হইবে। যে-উচ্চানন্দ যাত্রীর বর্তমান .. ভবিষ্যতকে অধিক সুখকর মধুর করিয়া তোলে এরূপ কর্মযোগীই ধন্য ও পুণ্যবান।

বিশাল বিরাট যাহা আজ অজ্ঞাত রহিয়াছে, নিজ সাধন দ্বারা তাহাকেই অন্তরের অন্তরতম স্থানে স্থির আসনে রাখিয়া, উচ্চ মহানকে অতি নিকট আপন করিয়া, পরমানন্দে সত্যের আস্বাদ লাভ করিয়া, সুখময় দিব্যলোকে সাধক বিরাজ

করে। এই সুখাস্বাদে মুগ্ধ হইয়া ধর্মপিপাসু মানব বাহ্যসুখ বিসর্জন দিয়া অসীম অনন্ত অপরূপ ভূমানন্দে মগ্ন থাকিতে লুব্ধ হয়। সাধকের তাহাতে অবসাদ নাই, অতৃপ্তি নাই কেবল একানন্দে এক যোগে সে আত্মহারা থাকে।

নিত্যানন্দ

পিতামাতার একমাত্র পুত্র শ্রীমৎনিত্যানন্দ প্রভুকে ভিক্ষা লইয়া এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রথম তীর্থ বক্রেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, "প্রথমে চলিলেন প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।" এস্থানে আসিয়া প্রেমপ্রতিমা প্রভুপাদ নিত্যানন্দ দীক্ষিত হইলেন এবং প্রথম এই তীর্থক্ষেত্রে প্রেমবীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল। মন্ত্র দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদ্দীপন হওয়ায় তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মেরুদণ্ড শ্রীমৎ মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশে অদ্বিতীয় পুরুষ যুগধর্ম প্রচারক তাঁহার হৃদয়ে প্রেমবীজ প্রথম এই বক্রেশ্বর মহাতীর্থে রোপিত ও অঙ্কুরিত হয়।

সেই বালব্রহ্মচারী শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্য গ্রহণের উপযোগী হইয়াছিলেন। মন্ত্রলাভের পর তাঁহার বৈরাগ্য অবস্থায় উত্তম অবধূত ভাব তাঁহাতে প্রকাশ পায়। তিনি পিতামাতার স্নেহবন্ধনে হইতে মুক্ত হইয়া এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোনো অজ্ঞাত অনির্বচনীয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে জন্মভূমি এক চক্রা গ্রাম হইতে এই তপস্বিগণের বহু আরাধনার স্থানে আসিয়া দীক্ষান্তে নবজীবন লাভ করিয়া, নূতন উদ্যমে প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং কালে তিনি এই ধর্মপ্রচারের অগ্রণী রূপে বিবেচিত হন।

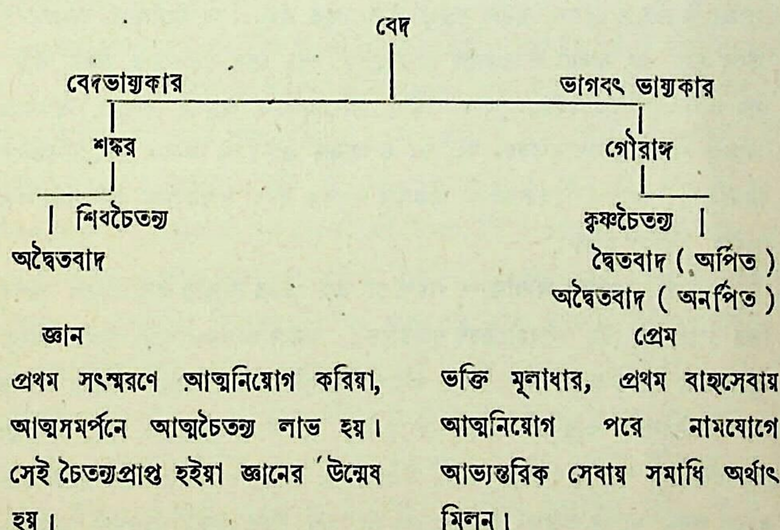
এই ক্ষেত্রে শ্বেতগঙ্গার উত্তরভাগে অক্ষয় বটমূলে প্রভুপাদ শ্রীমৎ নিত্যানন্দের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাঁহার চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে। দর্শনাকাঙ্ক্ষী বা পূতাত্মা কেহ কেহ তথায় পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যান। পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে এই পদাঙ্ক চিহ্ন রহিয়াছে। কিঞ্চিৎন্যূন পাঁচশত বৎসর গত হইল, কোনো প্রেমিক পুরুষ এই পবিত্র ক্ষেত্রে বাল্যাবস্থা হইলেও উচ্চাধারজ্ঞানে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নিত্যানন্দকে সংস্কারান্তে তাঁহার শুদ্ধ পবিত্র অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমবীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাই কালে শ্রীমৎ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতারের সহিত মিলিত হইয়া ফুল-ফল-সম্ভারে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রভুপাদ শুধু রাঢ়খণ্ডে নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই প্রথম ও প্রধান কৃপালাভ ক্ষেত্র

এই বক্রেশ্বর তীর্থ। এই স্থান বৈষ্ণব সমাজের অতি সমাদরের হইলেও প্রশ্ন জাগে যে কোন্ বিচার বুদ্ধিতে এযাবৎ তাঁহাদের দ্বারা এ স্থান উপেক্ষিত এবং অলক্ষিত ভাবে রহিয়াছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিগলিত, অমৃতময় মধুর আস্বাদনে মহাভাবে ঢল ঢল প্রভুপাদ সর্বভারত পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণ করিবার প্রথম প্রেরণা এই তীর্থে লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমাবধি বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠায় পরিপূর্ণ সদানন্দে আত্মহারা প্রেমরসবর্ষণে সদাআপ্লুত নবঘনজলধর শ্যামবরণে ও শ্রীমতীর স্থির বিজলী প্রভাদর্শনে যাঁহার সরস হৃদয় মৃদু তরঙ্গে হিল্লোলিত সেই প্রেমিক রসরাজ নব-কিশোর কিশোরীর প্রেমাসক্ত নিত্যানন্দ অবধূতের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া স্মরণ করিতেছি।

শ্রীমৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়কায়, পরকায় বা কায়ব্যূহ স্বরূপ শ্রীমৎ প্রভুপাদ নিত্যানন্দ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দীর্ঘসঞ্চিত কৃষ্ণপ্রেম রস সম্পদ কালে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্য দিয়া অপরূপ উদার উন্নতভাবে সর্বকাম্য ভক্তিরস আস্বাদ লাভের সুযোগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পাইয়াছিলেন। শ্রীমৎ মহাপ্রভু কর্তৃক যে মত প্রচারিত এবং শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুপাদ কর্তৃক ওতপ্রোত ভাবে অনুভূত ও আচরিত এবং যে-ধর্মভাবের ভিত্তিতে তাঁহার জীবনাদর্শ গঠিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। যে মহাভাবে বিভোর হইয়া প্রভুপাদ নিত্যানন্দ বাহ্যে গদ গদ ঢল ঢল অবস্থায় থাকিতেন, তাহা কোন্ মত পোষণে ও আচরণে সেই সম্পর্কে নিম্নে স্বল্প লিখিত হইল।



প্রথম সৎস্মরণে আত্মনিয়োগ করিয়া, আত্মসমর্পনে আত্মচৈতন্য লাভ হয়। সেই চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

ভক্তি মূলাধার, প্রথম বাহ্যসেবায় আত্মনিয়োগ পরে নামযোগে আভ্যন্তরিক সেবায় সমাধি অর্থাৎ মিলন।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ :— অচিন্ত্য = চিন্তানধিগম্য, অদ্বৈত, চিন্তাতীত, অব্যক্ত, সমাধিস্থ অবস্থা।

ভেদ=বিভক্ত, দ্বৈত, সাকার, সগুণ, ব্যক্তবোধ্য, অনুভব্য অর্থাৎ বিরহে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কাতর, পরে মিলনে সুখানুভূতি, বিহ্বল, রূপরসলালসা মগ্ন, আত্ম-নিমজ্জিত, আত্মহারা অবস্থা।

ভেদ=প্রকৃতি ও পুরুষ যুগ্মভাবে এক অপরের মিলন স্পৃহায় কাতর হইয়া আত্মবিলুপ্তিতে "অভেদ" হইয়াছেন।

অভেদ=অদ্বৈত অবস্থায় সোঽহং বা ব্রহ্মাস্মি সময় অনুভূত হয়। দ্বৈত মিলন ইচ্ছায় কাতর, আকুলতায় অধীর হইয়া সংজ্ঞাহীন সমাধিস্থ অবস্থায় মিলিত, বাহ্য বোধ লুপ্ত, স্বল্পক্ষণ হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী আধারভেদে হয়।

অচিন্ত্যভেদ=সাধারণ বোধগম্য অবস্থায় যাহাতে প্রকাশ্যে লাভ হয় এবং চিন্তায় অনুভূত হয় তজ্জন্য বিভক্ত দ্বৈত যুগল মূর্তি ধ্যান ও প্রত্যক্ষ সেবা আচরিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে-ভেদ তাহা প্রথমাবস্থায় উপলব্ধি হয় না। ইহাই অচিন্ত্য, পরে কর্মানুরাগ, সৎসেবা ও একবদ্ধচিন্তা প্রগাঢ় হইলে ভেদজ্ঞান উদয় ও মুক্ত হয়। দেহাবরণ আত্মা ও আত্মবিলুপ্তিতে মুক্ত পরমাত্মা হইতে ভেদ সৃষ্টি করায় উভয়ের একাবস্থা চিন্তা অতীত হওয়ায় 'অচিন্ত্য' আখ্যাত হইয়াছে। গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় সেই অচিন্ত্য অভাবনীয় বোধগম্য অনুভূতি আয়ত্ত হইবামাত্র তখনই ভেদ দূর হয়। নৈকট্যলাভে ভেদমুক্ত, একাধারে মিলিত বিভক্ত যুগ্ম হয়। নিজ আধারে অনুভূতিলুপ্ত হইয়া মুক্ত আধারে মিলিত হওয়ায় সংজ্ঞা বিলুপ্তিতে কেবল আনন্দ অনুভূতিতে স্থিত হয়। আত্মশুদ্ধিতে সৎজ্ঞানের উদয় এবং সৎ সাধনা ও সংশ্রবে আত্মচৈতন্য পরে ব্রহ্ম চৈতন্যের উদয় ঘটে। সৎ ও চিৎ মিলিত হইয়া, হৃদয়ে গভীর আত্মানুভূতি জাগ্রত করিয়া, একমাত্র আনন্দ স্রোতে ভাসমান হইয়া সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন মিলনে ওতপ্রোতভাবে নিমজ্জিত রহিল। দ্বৈতাচরণে একনিষ্ঠ সেবক হইয়া প্রথমব্যক্ত কর্ম প্রকাশিত অর্থাৎ 'অর্পিত' হইল।

অচিন্ত্য অভেদ : জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় আধার এক হইতে অপর ভিন্ন বোধ সাধারণ জীবমাত্রেরই রহিয়াছে। কর্মযোগ সাধন দ্বারা একাগ্র হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ক্রমে তাহা বর্ধিত ও পুষ্ট হওয়ায় উভয় আত্মার অভিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। পরমাত্মা মুক্তাধার 'সঃ', জীবাত্মা আবরণ বদ্ধ আধার 'অহং,' এই উভয় ভিন্ন অবস্থা আত্মচৈতন্য লাভে মুক্ত হইলে তখন অভেদ অবস্থা অবগত বা তদবস্থায় স্থিত হয়। যতক্ষণ দেহাত্ম-

বোধ রহিবে ততক্ষণ অভেদ অবস্থা অচিন্ত্য রহে। পরে আত্মজ্ঞান লাভ ও পরিপুষ্ট হইলে সেই পরিপক্ক অবস্থায় "তিনি ও আমি" ভিন্ন নহি। একই আধারে উভয়ে মিলিত জ্ঞান প্রগাঢ় হওয়ায় চিন্তাধিগম্য হয়। উভয় আত্মার ভেদজ্ঞান লোপ হইয়া এক অবস্থায় একরূপ আত্মঅস্তিত্ববোধ বিলুপ্ত হওয়ায় শুদ্ধ আধারে অভেদবোধ হয়।

প্রথম "অহং" দ্বিতীয় "সঃ" এই উভয় মিলিত হওয়ায় আত্মভিন্ন আধার সংজ্ঞা লোপ হয়, তখন আর চিন্তা রহে না। আত্মমধ্যে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব প্রগাঢ় বোধ এবং আত্মবিস্মৃত হওয়ায় মগ্নাবস্থায় একাত্ম মিলিত 'অহং' লুপ্ত তদ্গত ও চিন্ময় ভাবে সমাধিস্থ অবস্থায় স্থিত হয়। এমতাবস্থায় কদাপি প্রকাশিত হইয়াছে কারণ তাহা "অচিন্ত্য" চিন্তাতীত এবং অব্যক্ত রহিয়া গিয়াছে। ইহা সর্বসাধারণে প্রথম হইতেই আচরণ করিবার চেষ্টা করিলে, মূল সৎ আধারকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি আসিবে এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অনর্পিত করিয়া গিয়াছেন। তবে উন্নত আধারে স্বাভাবিক ধারাস্রোতে আগত হইবে। সেই জন্য প্রথম প্রকাশ বা আচরণ করিবার প্রয়োজনে 'অর্পিত' করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ঃ—কালের কুটিল কটাক্ষে সৃষ্টির রূপান্তর বা পরিবর্তন হইতেছে। সেই কারণে বিশ্বসৃষ্টি বা বাহ্যজগৎ পরিবর্তনশীল। ফলে তাহা মায়া বা মিথ্যা। এক কালে যাহা আছে পরকালে যাহার রূপ নাই, চিহ্ন নাই, পূর্ব সুগঠিত চিহ্নের বিলুপ্তিতে স্মৃতি নাশ হইয়াছে, তাহাই মায়া বা ক্ষয়শীল অবস্থান্তরবাদ বা বিবর্তবাদ।

একমাত্র জগৎস্রষ্টা পূর্ণ বিধাতা যিনি সত্য শাশ্বত ও সনাতন তিনিই ব্রহ্ম নামে খ্যাত হন। তিনি একমাত্র অপরিবর্তনশীল কালাতীত, অন্তরানুভূতিতে প্রকাশ, চেতনবিবেক বা জ্ঞানে স্বয়ং প্রকাশ। যদিও বিরাট ব্রহ্ম সাধারণ বোধগম্য বা ধারণান্তর্গত নহে তথাপি উন্নত আধারে সূক্ষ্মানুভূতিতে তিনি স্বপ্রকাশ হন। চেতন অর্থাৎ বিবেকসজাগ অবস্থায় জ্ঞানের উন্মেষ, স্থিতি ও লয়ের পার্থক্য বোধ।

সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের বিরাটে অবস্থিতি তাঁহারই; বিভূতির একাংশে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ঐশ্বর্য বা বিভূতির প্রকাশ যাহা হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। তাহাকে সত্য জ্ঞান করিয়া মানব আত্মহারা হইলে কালে বা যুগপরিবর্তনে যখন সেই সৃষ্টি লোপ হয় তখন মায়ার কবলীভূত মনুষ্যকে সংশোধনের সুযোগ দান করে।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য লিখিত গঙ্গা গোবিন্দ ভবানী বা অন্নপূর্ণা প্রভৃতি স্তুতি হইতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেভাবে ভাবান্বিত হইয়া ভাষায়

তাঁহার স্তুতি লিখিত হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার এক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীতে তাঁহার থাকাকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানান্তে তিনি বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গে প্রতিদিন জলাধার দিতেন, ইহাই সাকার সগুণের উপাসনা। এক সময়ে স্নানান্তে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁহাকে পার্বতী দর্শন দিয়াছিলেন, তৎপরে বিশ্বনাথ মন্দির দ্বারে স্বয়ং মহাদেব দর্শন দিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করায় সর্ব সময় দৃঢ়তার সহিত তিনি সেই বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদের এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্মের উক্তি তাঁহার সর্বভাবে ও ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সৎকে আশ্রয় এবং সেই চেতনা লাভ করিয়া অখণ্ড আনন্দের রসাস্বাদ মনুষ্যের এক অন্তিম সাধনার পরিপক্ক ফল।

যিনি কায়া নহেন, মায়া নহেন, ছায়া নহেন একমাত্র জ্ঞানে হৃদয়ে যাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় তাঁহাকে শূন্য বলা যায় না। যখন তিনি স্বীকার্য অনুভবে হৃদয়ঙ্গম তখন তাহাকে কিরূপে অনুভূতির বা ধারণার অতীত বলা যায়! যাহা চিন্তার গভীর অবস্থায় ধৃত হয় তাহা কিরূপে অস্বীকার করা যায়! আত্মচৈতন্যে যাহার প্রকাশ সৎজ্ঞানের উক্তি সত্যাশ্রয়ে যাহা সৎ হইতে আগত, তাহাই স্বয়ংসিদ্ধ সাধনালব্ধ চেতন বা জ্ঞানের উন্মেষমাত্র।

আত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে অব্যক্ত ভাবের অনুভূতি তাহাতেই তিনি ধৃত বা বদ্ধ হইতেছেন। অচঞ্চল যোগে যে নিগূঢ় অব্যক্ত সত্যের অনুভূতিতে চেতন বা জ্ঞানে আগত তাহাই বিরাট ব্রহ্মখণ্ডে ধৃত হইয়াছেন। মানবাত্মা বিন্দু হইলেও সৎ-এ যুক্ত হওয়ায় তাহার চিত্ত প্রসারিত হওয়ায় অদ্বৈতে সে স্থিতিবান। তখন 'অহং'-এর বিলোপে "সঃ"-এ স্থিতি হয়, আত্ম অনাত্ম একীভূত হইয়া অখণ্ডে লীন হয়। সৎ চেতনে বা সত্যজ্ঞানে তাহার স্বীকৃতি বা প্রকাশ; যোগ বা মিলন অবস্থায় আনন্দে তাহার স্থিতি।

তৃতীয় স্তবক

যে সব চিন্তাশীল গুণী ব্যক্তি বক্রেশ্বর তীর্থে বিভিন্ন সময়ে বাস করিয়া ঐ স্থানের গৌরব নিজগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানগিরি বাবা, দুধগিরি বাবা, ব্রহ্মচারী বাবা, খাকি বাবা, অঘোরী বাবা, চক্রবর্তী বাবা, ব্যোমানন্দ বাবা এই সপ্তজন মনীষী। এক এক তাপস সময়োপযোগী আদর্শ চরিত্রের পরিচয় দিয়া নিজ সাধনা অর্জিত সত্যের সন্ধান লোকসংঘে দান করিয়া গিয়াছেন। উন্নত ত্যাগী পুরুষ একমাত্র ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া কোনো অভাবনীয় কর্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া, কোন্ বাক্যাতীত অবস্থায় বিরাজিত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের কর্মে, আচরণে ও লৌকিক ব্যবহারে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছিল।

তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা জানা গিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এবং মহামানবগণের কৃপালব্ধ বাণী যাহা জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি তাহা কয়েক স্থানে লিখিত হইয়াছে। আত্মনির্ভরশীল হইয়া দেবানুগ্রহপ্রার্থী হইয়া মহামান্য সত্যদ্রষ্টা তপোব্রতিগণের শরণাপন্ন হইয়া, যাহা কিছু জ্ঞাত হইবার সুযোগ পাইয়াছি তাহাই নিঃসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিতে আমি সাহসী হইলাম।

সাধনাক্ষেত্রে তপোভূমিতে ধর্মপিপাসু জনগণের জীবনের শান্তিদাতা হইয়া যাঁহারা সর্বোন্নত সাম্য অবস্থায় স্থিতিবান হইয়া জীবহিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন সেই সব তপোনিধি মহাত্মাদিগের কৃপালাভে যে-ক্ষুদ্র প্রেরণা আমার মনোমধ্যে জাগরিত হইয়াছে, তাহা কয়েকক্ষেত্রে নির্ভয়ে প্রকাশ্যবোধে লিখিত হইতেছে।

বীর সাধক ব্রহ্মচারী তাপসগণ অনন্য সাধারণ সাধনালব্ধ উচ্চ উদার মুক্ত অবস্থায় স্থিত হইয়া নির্বিকার চিত্তে সকলকে প্রেমবন্ধনে বদ্ধ ও তৃপ্ত করিবার সুযোগ লইতেন। এ তীর্থক্ষেত্রের যে অকৃত্রিম তপোগুণাধিক্য তথায় দেবাদিদেব বক্রেশ্বর এবং পরমাসতী মহিষমর্দিনীর করুণায় পরিপুষ্ট হইয়া এ স্থল তাঁহারা সুর ভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

বাসনায় নিস্পৃহ, বিলাস বর্জিত, বৃথালাপে সঙ্কুচিত, তপোধনে সমৃদ্ধ, করুণা-বর্ষণে নিরপেক্ষ, গভীর প্রেমে আত্মহারা সেই সপ্ত তপস্বীর পরিচয় দিবার

সুযোগ একমাত্র তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল বলিয়া অকপট দয়ালাভের আশায় সৎজীবন বন্ধনে আমি উৎসাহী হইয়াছি।

মানগিরি :—হিমালয়ের কোন্ গিরি গহ্বরে অরণ্য মধ্যে গণ্ডক নদীর উৎপত্তি স্থানে একান্তে মানগিরি মহারাজ তপোব্রতী হইয়া কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। তৎপরে হিমালয়ে কুশী নদীর উৎপত্তি স্থানে দীর্ঘ কালযাপন করিয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ও শুভ্র তুষারাবৃত হিমগিরির গহ্বরে একান্ত বাসে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়া সত্যের সন্ধানে যুক্ত ছিলেন। সেই চির তুষারাবৃত স্থান দেহমন তৃপ্তির অনুকূল—এই জ্ঞানে অনির্বচনীয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকিবার জন্য তপস্বিগণ এই স্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন। সেস্থানে বিশেষ কোন আহার না থাকিলেও তথাকার কন্দ মূলাদির সন্ধান সাধুগণ জানিতেন এবং তাহা আহার করিবার রীতিও তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন। স্বল্লাহারে যোগীগণ পর্বতগুহা মধ্যে শীত পীড়িত না হইয়া যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যানুভূতি স্তব্ধ করিয়া অন্তরে নিমগ্ন থাকিতেন।

মানগিরি বাবা সর্বোচ্চ গিরি হিমালয়ে দীর্ঘকাল নীরব উচ্চাঙ্গের যোগ সাধনায় যুক্ত থাকিয়া মহাদেব কৈলাসপতির কোনো আদেশে এই বঙ্গভূমির মধ্যে বীরভূম জেলার একপ্রান্তে কঠোর তপস্বী অষ্টাবক্রমুনির তপোভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কোনো প্রেমিক যোগেশ্বর বক্রেশ্বরদেবের মহৎ আকর্ষণে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া মানগিরি মহারাজ অবশেষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উচ্চক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মুনিবর মানগিরি বাবা বক্রেশ্বরে আসিয়া অতি সরল জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত হইলেন। তিনি প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত হইয়া, এই তীর্থোপযোগী ঋতুপ্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া, সদানন্দে নিজ কুটীরে আত্মকর্মে যুক্ত থাকিতেন।

যুক্ত যোগীর সাধনা ক্ষেত্র বক্রেশ্বর তীর্থে মুনিকুলমণি মানগিরি মহারাজ সর্বানন্দে ভক্তগণ মধ্যে সদা বিরাজ করিতেন। ধর্মার্জন কৌশলপদ্ধতি জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে তিনি তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। বায়ু সংযত করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, তাহার সাধনের সহজ উপায়, সদা স্মরণ অভ্যাস করা—এইরূপ বাক্য দ্বারা তিনি সকলকে সৎপথ আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিতেন। উন্মুখ জীব এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদাচরণ ও তৎপালনে চেষ্টা করিত।

"সাধন সিদ্ধির প্রথম পরিচয়, সত্যনিষ্ঠা সরল হৃদয় যে-ব্যক্তি, সেই উত্তম কৃপা লাভ করিয়াছে", এইরূপ তাঁহার বাণী ছিল।

"যাহার হৃদয়ে সরলতা নাই, যে সত্যাশ্রয়ী নহে, সে গভীর পঙ্কিল পথে ভ্রমণ

করিতেছে। পরশ্রীকাতর মাৎসর্য রিপুবশ, কি গৃহী কি ত্যাগী ঘোরাচ্ছন্ন জীবনে দাবানলে দগ্ধ হয় এবং সকল পবিত্র সাধন তাহার ভস্মীভূত হইয়া যায়। সকল রিপু সাধনের অন্তরায় হইলেও কোনো টিকে অবহেলা করা বা সৎ বিমুখী হইতে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।"

এইরূপে স্বল্পবাক্যে সৎজ্ঞান তিনি দান করিতেন। সর্ববরেণ্য এই তীর্থের উত্তম পুরুষ মানগিরি মহারাজ এই উচ্চ তীর্থস্থানের পবিত্রতা প্রায় আড়াই-শত বৎসর পূর্বে নিজ আচরণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মানগিরি বাবার দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, ক্ষীণ সুঠাম দেহ কঠোর অপার অঙ্গকান্তি সকলকে আকৃষ্ট করিত। তপোরত মহাযোগী জীবদ্দশায় ত্রিতাপ পীড়িত মনুষ্যগণকে নিজ জ্ঞান ও গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থির ধীর মধুর স্বভাব এবং তাঁহার মধুর মৃদু ভাষায় সকলে আকৃষ্ট ও অনুগত হইত। স্বল্পাহারী অল্পভাষী তপস্বী গিরিবাবা দিবারাত্র অধিক সময় আত্মযোগে যুক্ত থাকিতেন। তিনি মুমুর্ষুগণকে সৎজ্ঞান দান করিতেন। আত্ম সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি অধিককাল যাপন করিয়া ভূমানন্দে মগ্ন থাকিতেন। পাপী, তাপী, গুণীজন সকলকে সমব্যবহারে সমাদৃত করিতেন। সদাচারী সত্য-পালনব্রতী মনুষ্য তাঁহার প্রিয় ছিল। গিরিবাবা ক্ষণকালের মিলনে ভক্তগণকে তৃপ্ত করিতেন। তিনি সৎসাহস অভয় তাহাদিগকে দান করিতেন। উন্নত আশায় লোকে হতাশ হইয়া আসিলে তাহারা তাঁহার নিকট শান্তিলাভ করিত। তাঁহার উদার উচ্চ উপদেশ সমস্ত সম্প্রদায়েরই প্রিয় ছিল। সেই সৎপুরুষ সাধন দ্বারা যে-শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন জগতে সেই চিরন্তন সত্য প্রকাশ করিয়া তিনি আনন্দ বর্ধন ও প্রকৃতজ্ঞানের উদয় করিয়া দিতেন। দেব আরাধনা সৎচিন্তা সকলের প্রিয় হউক এই লক্ষ্য তাঁহার প্রতি বাক্যে ও কর্মে প্রকাশ পাইত।

কথিত আছে যে এক সময় মানগিরি বাবা বক্রেশ্বর তীর্থের চতুষ্পার্শ্বের পঞ্চগ্রামীণ জনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক পাত্র খিচুড়ী ও এক পাত্র ব্যঞ্জন পাক করাইয়া আগত সকলকে সেবা করাইতে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু লোকসংখ্যা অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন অত্যল্প থাকায়—উপস্থিত কর্ম উদ্‌যোগী পুরুষেরা সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। গিরিবাবা সকলকে আশ্বাস দিয়া সকলকে সেবা করাইতে বসাইলেন। লোক যত হউক ঐ পাত্র হইতে সেবার জন্যে অন্নব্যঞ্জনাদি যতই বিতরিত হইল, পাত্র সর্বদাই পূর্ণ ছিল। ইহাতে মানগিরিবাবার লোকাতীত শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হয়।

মানগিরি বাবা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া শ্বেতগঙ্গার উত্তরপূর্ব ভাগে ঈশানকোণে নিজ সমাধির জন্য মৃত্তিকা খনন করাইয়া তন্মধ্যে নিজে যোগাসনে বসিলেন। কেহ জীবন্ত মনুষ্যের দেহের উপর মৃত্তিকা আচ্ছাদন করিয়া দিতে অগ্রসর হইল না। গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি নিজ হস্তে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দেহের উপর নিক্ষেপ করিলে পর লোকে তাহাকে যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই সমাধিস্থ করে।

যেদিন মানগিরি বাবা দেহরক্ষা করেন সেইদিন কাশীতে মানগিরি বাবার সহিত বক্রেশ্বর তীর্থের এক সেবায়েতের সাক্ষাৎ হয়। মানগিরিবাবা তথায় ঐ সেবায়েতকে বলিয়াছিলেন, "বক্রেশ্বরে আমার সমাধির উপর এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করাইবে এবং যে কোন শূলব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি ঐ স্থানের মৃত্তিকা লইয়া কিঞ্চিৎ মুখে দিলে এবং দেহের বেদনা স্থানে শুষ্ক রজ লেপন করিলে তাহার দেহ নীরোগ হইবে।

পূর্বোক্ত বাক্য সেবায়েতকে বলিয়া গিরিবাবা অন্তর্হিত হইলেন। সেই সেবায়েত গৃহে আসিয়া শুনিলেন মানগিরি বাবা এই মিলনের পূর্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সকলেই এই বাক্যে এবং দেহান্তের পর সিদ্ধ দেহে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়ায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

সেকালে এই তীর্থে মানগিরি বাবা এক অসাধারণ শক্তিমান সৎ পুরুষ ছিলেন। তিনি সমাধিস্থ হইয়াও অদ্যাপিও জীবিতের ন্যায় পূজিত হইতেছেন।

সিউড়ী জেলা বোর্ডের জনৈক স্থপতির কার্য ও পথপরিদর্শক এই তীর্থে আসিয়া মানগিরিবাবার স্থানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার পিতা অম্লশূল ব্যাধিতে বিশেষ পীড়িত; বহু চিকিৎসা করাইয়া কোন সুফল হয় নাই।"

তিনি উপরিউক্ত স্থানের মহিমা শুনিয়া তৎবাক্যানুযায়ী রুগ্নপিতা মানগিরি বাবার শরণাপন্ন হইয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ পিতা সুস্থ হইয়া আসিয়া এই তীর্থে বহু উপচারে পূজা এবং ব্রাহ্মণাদি জনগণকে সেবা করাইয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর হইতে প্রায় দুইক্রোশ উত্তরপশ্চিম কোণাংশে বায়ুকোণে চাউলে গ্রামের এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অম্লশূল রোগে মরণাপন্ন হইয়া বৈদ্যনাথ ধামে ধরনা দিতে গিয়াছিলেন। তথায় কয়দিন কঠোর নিয়মে থাকার পর দৈব আদেশ হয় যে বক্রেশ্বরে সাধু মানগিরির সমাধিস্থানের মৃত্তিকা মুখে ভক্তি করিয়া দিবে এবং শুষ্ক রজ উদরে হস্ত দ্বারা লেপন করিবে।"

সেই বাক্যানুসারে রুগ্নব্যক্তি বক্রেশ্বরে আসিয়া প্রায় এক পক্ষকাল থাকিয়া দেবাদেশ অনুযায়ী কর্ম করিয়া সুস্থ হয়। নীরোগ হইয়া সেই ব্যক্তি মানগিরি বাবার নিকট মানসিক চূড়া, গুড়, খড়ম, চিমটি, বর্হিবাস প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া সমাধি মন্দির স্থানে পূজা করাইয়াছিলেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণকে লুচি ফলাহার দ্বারা তৃপ্ত করাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার ছয়মাস পরে পুনরায় যখন সেই ব্যক্তি বক্রেশ্বরদেব দর্শনে আসেন বক্রেশ্বরবাসীরা তাঁহার শরীরের সবল কান্তি দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হন।

আত্মদর্শী মানগিরিবাবা প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ তীর্থে বাস করিয়াছিলেন। যুগধর্মোপযোগী কর্ম আচরণ করিয়া আত্মনিষ্ঠ যোগীবর লোক-শিক্ষা দান করিতেন। তিনি স্বাবলম্বী হইয়া স্থির আসনে স্বকর্মে অনাড়ম্বরে কালাতিপাত করিতেন। তিনি কাহার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, কোন্ চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইতেন তাহা অপর জনের বোধগম্য ছিল না। তিনি বাহিরে অতি সাধারণ পুরুষের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিতেন। সেই মহামানব তপস্বীর প্রতিকর্মই বিহ্বল মনুষ্যের ন্যায় বাহ্যাচরণে উদ্ভাসিত হইত। তিনি আত্মধ্যানে যাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া সুখময় আত্মানন্দে বিভোর হইতেন তাহা একমাত্র মনীষিগণের বোধ্য। মর্তলোকে বিচরণ করিয়া সুরলোকের দেবানুভূতি তাঁহার মনকে সদা আকৃষ্ট ও আসক্ত করিয়া রাখিত। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠায় অবস্থিত, অতি সরল সদাচারে তৃপ্তমন মানগিরিবাবা তন্ময় অবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেন। স্বল্পে তুষ্ট সেই মহাজ্ঞানী বিচার বিকার মুক্ত হইয়া সর্বসিদ্ধিদাতা দেবাদিদেব বক্রনাথ ও অবিদ্যানাশিনী দেবী মহিষমর্দিনীর কোন্ অব্যক্ত অভাবনীয় অমৃতময় সুরারসে সরস রহিতেন—কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে! সেই মুক্ত মানব সকল বাসনা দূর করিয়া নিবৃত্তি মার্গে নির্বাণের পথের পথিক ছিলেন—কে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কাহার নৈকট্য লাভে, হৃদয়ে কাহার স্পর্শ সুখে তিনি বিহ্বল থাকিতেন—এ কথা কে বুঝিয়া তাঁহার গোপন পরিচয় পাইবার সুযোগ লইয়াছে? মানগিরি মহারাজ এইরূপ বাণী বলিতেন: "কাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিব? একমাত্র জীবনের অধিষ্ঠানকারী দেবতা তিনি সর্বমঙ্গলময় ও সর্বজ্ঞাতা, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিয়া পরম শান্তি ও চিরন্তন সুখের আস্বাদ লাভ হয়। যিনি বিশ্বস্রষ্টা তিনিই একমাত্র জীবের সুখদুঃখ দাতা এবং সর্বত্রাতা, তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া মনুষ্য অতি আনন্দময় জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করিতে পারে। তাঁহাকে নিকট জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে কদাপি

কাহাকেও অবস্থা বিপর্যয়ে বিপন্ন হইতে হয় না। তাঁহার সহিত সামীপ্য লাভের একমাত্র সুযোগ তৎনাম স্মরণ, আত্মনিবেদন ও তৎযোগে আত্মনিবিষ্ট অবস্থায় স্থিতি লাভ করা"।

বিবেকমান মানব আত্মচৈতন্য লাভ করিয়া সৎ আশ্রয় করে। ইহাই পূর্বজন্ম অর্জিত সঞ্চিত সাধনার ফল। চিদানন্দের এ চিন্তনে রত লোক কখনো অলস হইবে না। কারণ এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে জীবদ্দশায় আমার সৎকর্ম যথাসাধ্য সমাধা না করিলে নিজ কার্য অসমাপ্ত রহিয়া যাইবে। যাহার মনে এই দায়িত্ববোধ রহিয়াছে সে অনবসর জীবন অনন্য স্মরণে অতিবাহন করে। বৃথা বাক্য বা কর্মে, নিদ্রালসে কালক্ষয় করিয়া কর্তব্যহীন কাপুরুষের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা মনুষ্যের জীবনের একমাত্র অপরাধ।

অপরের মধ্যে সদাসৎ-এর পরিচয়লিপি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। নিজে সৎ থাকিয়া সৎধর্ম পালন করিলে কালে কর্মবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব অভিনব আনন্দ উপলব্ধি করিয়া বাক্যাতীত অবস্থায় বিরাজ করিবার সুযোগ মনুষ্য লাভ করে। কে ধনী, কে দরিদ্র, কে গুণী, কে অবিবেকী, কে সাধক, কে প্রেমিক, কে ভাবুক, কে গুণগ্রাহী এ সন্ধানের প্রয়োজন নাই। একমাত্র আত্মসমর্পণে যে গভীর সুখস্বাদ অহরহ যুক্তযোগী লাভ করে, তাহা অপরের নিকট পরিচয় দিবার বা লইবার প্রয়োজন হয় না। কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন নাই। যিনি অভাবনীয় আনন্দ চৈতন্যময় বিরাট পুরুষ একমাত্র তাঁহারই স্মরণে অনুপম আনন্দে অধিকারী হইয়া, প্রেমবিলাসে ক্রীড়ারত এবং চরমের পরমানন্দ ভাবে বিহ্বল থাকিয়া বিকল্প রহিত অবস্থায় স্থিতি লাভের সুযোগ দান করে। অপরের অধিক কিছু লক্ষ্য করিবার নাই। কারণ একমাত্র সৎ-এর পরিচয়ে সকলের পরিচয় হয়।

দুখগিরি :—প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর পূর্বে কালের ক্রূর গতিতে দেশে ধর্ম বৈপরীত্য ঘটায় চতুর্দিকে নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী ধর্মবিপ্লবী জনগণের প্রভাবে আস্তিকতা মলিন হইয়া যাইতেছিল। ঐ সময় নর্মদা নদী তীরে গুরু আশ্রমে দুখগিরিবাবা নীরব সাধনায় রত ছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সর্বতীর্থে ভ্রমণ করিয়া উত্তরে বদরিনারায়ণ দক্ষিণে রামেশ্বর মহাদেব পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেব ও পশ্চিমে দ্বারকাধীশ এই চারিধাম এবং পথিমধ্যে অন্যান্য বহু তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। এইভাবে তীর্থপর্যটনের পর তিনি কিছুকাল শ্রীক্ষেত্রে অকূল জলধিতীরে শান্তিলাভের ইচ্ছায় অবস্থান করিয়াছিলেন। দুখগিরিবাবা পথিমধ্যে কোথাও ধর্মহীন সমাজে সনাতন ধর্মের উদার উন্নত পন্থার

সন্ধান দিয়া সকলকে সৎমুখী হইতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি পাত্র অপাত্র ভেদ না করিয়া, উচ্চ নীচ বিভাগ না করিয়া ধর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার সকলের আছে—এই উদার নীতি অবলম্বন করিয়া, দেশ বিদেশে ধর্মস্থাপনের জন্য বহু শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতিদীনভাবে নিজবেশ, ভূষণ, আহার, বিহার প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র গুরু আদেশ পালন করিতে, সর্বশ্রেণী মধ্যে, সত্যনিষ্ঠ বীর তপস্বী দুখগিরিবাবা অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেন।

ধর্মহীন নিষ্ঠুরগণের নির্মম ব্যবহারে কয়েকস্থানে কঠোর পীড়ন যাতনা নীরবে দুখগিরিবাবাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। ধর্মবিশ্বাসী সৎমিলন সুখী দুখগিরিবাবা দৈবকর্ম সাধনে সফলতা লাভ করিবে—এই বিশ্বাসে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করিয়া ধর্মবিমুখ কদাচারী সমাজদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল নরনারীকে সদাচার পালনে নিজজ্ঞান দ্বারা যুক্তি তর্ক সদুপদেশ দান করিয়া সত্য পালন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। প্রতিষ্ঠা গর্ব-বর্জিত এই নিরহঙ্কারী মহাপুরুষ প্রাণের ব্যাকুলতায় জীবনকে ক্ষুদ্রশক্তির বিনিময়ে সৎপথগামী করিবার ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিতে বিন্দুমাত্র বিমুখ হইতেন না। তিনি সৎধর্ম পালনে সদারত থাকিলেও অবসরকালে সকলকেই সদালাপে পরিতৃপ্ত করিতেন। ধর্মবিশ্বাস একনিষ্ঠ সাধনায় উন্নত এই মহাপুরুষ জীবগণের দুঃখনিবারণে সুযোগ বুঝিয়া সান্ত্বনা দিতেন ও সৎপথ অবলম্বন করাইতে সহায় হইতেন। দুখগিরিবাবা নিজের স্বল্প প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও নিকট কোন দ্রব্যের প্রত্যাশী হইতেন না।

গয়া জিলায় এক স্থানে এক জনসভায় দুখগিরিবাবা একেবারে অনাহূত হইয়া গিয়াছিলেন। তথায় অতি সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তথায় দ্বৈতঅদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য করিয়া অসাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন। কোন ব্যক্তি কাহারও মতের বিরোধিতা বা কাহারও সঙ্কীর্ণ ধর্মমত পোষণ করিয়া বিদ্বেষভাব প্রচার না করেন—এ বিষয়ে দৃঢ় বাক্যে সকলকে বুঝাইয়া বলেন।

"কোনো ধর্মগুরু নিজমত প্রচার করিয়া অনুদারতা পালন করেন নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল মনুষ্য কোন্ উপায়ে সংসারের বহুদুঃখ ত্রিতাপ নিবারণ করিতে পারে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেওয়া"।

তথাকার জনসমাজ এইরূপ নিরপেক্ষ ধর্মসম্প্রদায়হীন সঙ্কীর্ণতা বর্জিত ধর্মমতে সন্তুষ্ট হইয়া, দুখগিরিবাবাকে কিছু ভূখণ্ড দান করিয়া তথায় এক আশ্রম নির্মাণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিল। কিন্তু দুখীবাবা কোন বন্ধনে থাকিতে ইচ্ছা করেন নাই। বিষয়সম্পদে লোভ বা ভোগসুখ লালসায় তাঁহাকে কুত্রাপি লুব্ধ করিতে পারে নাই। দুখগিরিবাবা দীনভাবে দিন

কাটাইয়া, নিজ কর্মে নীরব থাকিয়া কাল অতিবাহিত করিতেন। তিনি নিজসেবার জন্য বহুস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন না বা কোন বাসনা পূর্ণ করিতে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করিতেন না বা কাহারও নিকট যাজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। দুখীবাবা স্বল্পভাষী হইয়া সদাপ্রফুল্লময় থাকিতেন, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অল্প কথায়'বাক্য সমাধা করিতেন। তিনি কাহারও প্রতি অপ্রিয় ভাষা প্রয়োগ কিংবা কাহাকেও অনাদর করিতেন না।

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরে দুখীবাবা বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়াছিলেন। তিনি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন এবং অষ্টাবক্র মুনির প্রতি অন্তরে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি ভাব পোষণ করিতেন। মুনিবর অষ্টাবক্রের একনিষ্ঠ কঠোর সাধনায় দেবাদিদেব বক্রেশ্বর কৃপা করিয়াছিলেন, এই সৎ উচ্চগুণের জন্য উক্ত মুনিশ্রেষ্ঠের প্রতি দুখগিরি বাবার গভীর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। এই তীর্থে অষ্টাবক্র মুনির দীর্ঘকাল সাধন জীবনে, বিবিধ সময় তাঁহার তপস্যাকালে, বক্রনাথ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানারূপ বরদান করিতে চাহিলেও কঠোর তপস্বী অষ্টাবক্রমুনি সে সুযোগ না লইয়া বা তাহাতে প্রলুব্ধ না হইয়া নিজ সঙ্কল্পিত সাধন কর্মে একনিষ্ঠ ভাবে রত থাকিতেন। মুনিবর অষ্টাবক্রের চরিত্রে এই কঠোরতা প্রেম ও অচল অটল দৃঢ় বিশ্বাস, দুখগিরিবাবাকে অত্যধিক আকৃষ্ট করায়, তিনি বক্রেশ্বরে আসিয়াছিলেন। এক শ্রেষ্ঠ মুনির সাধনক্ষেত্র উন্নত তপস্বীর অনুকূল নিবাসভূমি বুঝিয়া দুখগিরিবাবা একান্ত বাসের ইচ্ছায় এই তীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর দেবালয়ে অধিকসময় লোকসমাগম হওয়ায় এই তীর্থে একান্ত-বাসের উপযোগী স্থান নির্ণয় করিতে না পারায় দুখীবাবা চিন্তিত ছিলেন। দেবী মহিষমর্দিনীর আদেশে সেই মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিম ভাগে এক গুহা নির্মাণ করাইয়া তথায় দুখীবাবা বাস করিয়াছিলেন। তিনি দিবারাত্র জনসমাগমের অগোচরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আত্মানন্দে বিরাজ করিতেন। স্বল্প পরিসর গহ্বর মধ্যে স্বল্পায়োজনে সাধনার জন্য অতিস্বল্পই দ্রব্য তথায় রক্ষিত হইত। তিনি স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় নিজসেবা সংক্ষেপে সমাধা করিতেন। অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত দুখগিরিবাবা অনাসক্ত নির্লিপ্ত দীনহীনভাবে নিতান্ত সাধারণ পুরুষের ন্যায় এই মহান হৃদয় মহাত্মা অন্তরমুখী হইয়া থাকিতেন। কাহাকেও নিকটে আসিতে দেখিলে ভীত মানবের মৃদুভাষায় তাহার সহিত তিনি কথা বলিতেন। বাক্যালাপে মনে হইত যেন তিনি নিজেকে কত ক্ষুদ্র ভাবিয়া অতি সাবধানে লোকের সহিত আলাপ করিতেছেন।

এই সত্ত্বগুণী মহামানব দুখগিরিবাবা যোগধ্যানে রত থাকিলেও কাহাকেও উপেক্ষা বা অসম্মান করিতেন না। তাঁহার সহিত মিলিত হইলে কত আদরে তিনি সম্ভাষণ ও স্বল্প বাক্যে তুষ্ট করিয়া আগত ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন। তিনি অধিকক্ষণ কাহাকেও নিকটে থাকিবার সুযোগ দিতেন না। এই গম্ভীরা মধ্যে একান্তবাসে তিনি আনন্দে থাকিতেন। স্বভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ হইলেও সৎ সরল ব্যবহারে প্রিয়ভাষায় তিনি কথা বলিতেন। কেহ কিছু দান করিলে, তিনি নিত্য প্রয়োজনে যতটুকু আবশ্যক সেইটুকু লইয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ফিরাইয়া দিতেন। দাতা ব্যক্তি বারবার অনুরোধ করিলেও সঞ্চয় বুদ্ধিতে নিত্য প্রয়োজনের অধিক কিছু গ্রহণ করিতেন না।

দেবী মন্দিরের সংলগ্ন এক খিলান করা স্থানে গিরিবাবার দ্বারা নির্মিত গুহার আশ্রয় এবং তাহাতে একটি ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার রহিয়াছে। সাধারণ-দৃষ্টির বহির্ভাগে তিনি একান্তে আত্মযোগে যুক্ত থাকিয়া গোপনে নিজ আসনে আরাধনা করিতেন। এরূপ লুক্কায়িত স্থান বহিরাগত যাত্রীদের কদাপি নয়ন গোচর হইত না।

এই গম্ভীরার পশ্চিমাংশে তিনি অতিঅল্প আকারে এক পুষ্পোদ্যান করিয়াছিলেন। ক্বচিৎ কোন সময়ে কেহ এই দেউলের চতুর্দিকে গোচারণে এতদঞ্চলে আসিত। সেই সময় গাভীগুলি সন্ন্যাসীর পুষ্পবৃক্ষের ক্ষতি করিত। গিরিমহারাজ এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অমনোযোগ হেতু একদিন এক সেবায়েতের একটি বলদ, তাঁহার আশ্রম সংলগ্ন পুষ্প উদ্যানের অনিষ্ট করে। ঐ দিন সেবায়েত চতুর্দিকে সেই বলদের সন্ধান করিতে না পারিয়া, যখন গিরি-মহারাজ শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণাংশে সন্ধ্যাকালে বসিয়াছিলেন তখন তাঁহার নিকট আসিয়া কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমার বলদটি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না, দয়া করিয়া তাহার সন্ধান জানাইলে উপকৃত হইব।"

গিরিমহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "গোচারণে সতর্ক কি কারণে হও না? আমার অতি যত্নের ফুলের গাছগুলি গোপাল নষ্ট করিয়া যায়।"

সেবায়েত নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া দুখীবাবাকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিলেন। তখন দুখগিরি মহারাজ বলিলেন, "যাও আমার গুহা মধ্যে সন্ধান কর।"

সেবায়েত তথায় শীঘ্র আসিয়া অতি আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার বলদ গুহামধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া ঐ বৃহৎ জন্তুটি কিরূপে প্রবেশ করিল এই ভাবিয়া তিনি জন্তুটিকে বাহিরে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

পরিচিত প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলদটি আলস্য ত্যাগ করিল, কিন্তু তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছায় বাহিরে আসা অসম্ভব জানিয়া, সেবায়েত পুনরায় মহাপুরুষজীর নিকট শরণাপন্ন হইলেন। দুখগিরিবাবা আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া দুই অঙ্গুলিধ্বনি (তুড়ি) তিনবার করিয়া বলদটিকে বাহিরে আসিবার ইঙ্গিত করিলেন।

তখন বৃহদাকার জন্তুটি বাহিরে আসিল। এই অপার্থিব অষ্টসিদ্ধি গুণ সম্পন্ন যোগী নিভৃত গোপন বাসে আনন্দ লাভ করিতেন।

এই তীর্থের উত্তরাংশে গোয়ালিয়ারা নামক এক গ্রাম আছে। তথাকার এক ব্রাহ্মণ মোহনলাল অধিকারী গিরিবাবার নিকট বৈকালে মিলন ইচ্ছায় আসিতেন এবং সাধুসেবার জন্য তিনি গো-দুগ্ধ তাঁহাকে দিয়া যাইতেন। একদিন গিরিসন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেহে কোনো পীড়া ভোগ কর?"

অধিকারী উত্তর দিলেনঃ "আজ্ঞা হাঁ বাবা। আমি অম্লশূল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, কোনরূপে নিরাময় হইতেছে না। আপনি যদি কৃপা করেন তবে শান্তি লাভ করিব।"

গিরিমহারাজ পরদিন অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মণকে এই তীর্থে আসিতে বলিলেন।

রুগ্ন ব্রাহ্মণ পরদিন প্রাতে এই তীর্থে আসিলে গিরিসন্ন্যাসী তাহাকে শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিতে বলিলেন এবং নিজে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবার্চনা সমাধান্তে বাহিরে আসিয়া এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ, রোগীর বাহুমূলে (বগলে) কিছুকাল ধারণ করিতে বলিলেন। পীড়িত ব্রাহ্মণ সাধুবাক্য পালন করিয়া এইভাবে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

দুখগিরিবাবা সুস্থ সবল দেহকান্তি বিশিষ্ট ছিলেন। নাতিদীর্ঘ ঘন কুঞ্চিত কেশ ও শ্মশ্রুতে সমাচ্ছন্ন তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। কোন নিয়মিত সময় না থাকিলেও দিবসের যে কোন সময়ে তিনি একবার সাত্ত্বিক আহার করিতেন। সায়ংকালে দর্শন অভিলাষীদের সহিত তিনি মিলিত হইবার সুযোগ স্বল্পক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইতেন। তিনি সকল ঋতুতেই গুহা মধ্যে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এই গম্ভীরার মধ্যে থাকা বিশেষ কষ্টকর কিন্তু তিনি অবিচলিত চিত্তে তথায় আত্মকর্মে যুক্ত থাকিতেন। তাঁহার গুরুগম্ভীর মৃদুধ্বনি যুক্ত স্বল্পভাষে তিনি আগত শ্রোতাকে তুষ্ট করিতেন। ভগবৎবাক্য ব্যতীত তাঁহার নিকট সংসারী লোকের অপর কোন প্রার্থনা বা রোগ মুক্তি বিষয় আলোচনা প্রিয় ছিল না। নিজআসন ত্যাগ করিয়া তিনি কদাচিৎ বাহিরে বিচরণ

করিতেন। স্বল্পে তুষ্ট ভোগে নিস্পৃহ সরল উদাসী পুরুষ দুখীবাবা নিত্য যোগে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার নির্মিত এই গুহা ব্যতীত এ তীর্থে তাঁহার অপর কোনো চিহ্ন নাই।

জীবনের শেষ অবস্থায় দুখীবাবা এ স্থান ত্যাগ করিয়া কাশী বিশ্বনাথের চরণ দর্শনে ও গঙ্গাস্নানে গভীর আনন্দে দিন কাটাইয়াছিলেন। তথায় নিত্য নাম স্মরণে যুক্ত থাকিয়া এই যোগীশ্রেষ্ঠ সদা আত্মানন্দে লীন থাকিতেন। তিনি লোকাতীত শক্তির আধার হইয়াও জনসমাজে তাহা কথনো প্রকাশ করিতেন না। সর্বদা আত্মগোপনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই আত্মদর্শী পুরুষ যিনি আত্মনিবিষ্ট অবস্থায় তুষ্ট থাকিতেন তিনি কাহার যোগে কোন ধ্যানে যুক্ত থাকিতেন, দিবা বা রাত্র অনবসর জীবন কিভাবে কাটাইতেন তাহা জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও, কোনো ব্যক্তি সময়ে অসময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিত না। সাধক তপস্বী কর্মরত অবস্থায় শান্তিতে থাকিতে চাহেন, শিষ্টাচার হেতু কদাপি কোন লোক তাঁহার নিকট প্রবেশাধিকার পাইত না। বহিরাগত জনের সহিত তাঁহার স্বল্প প্রয়োজন যাহা হইত তাঁহাদের নিজ কর্মের দ্বারাই সেই প্রয়োজন সমাধা করাইতেন।

ব্রহ্মচারী বাবা :—কোন দূর দূরান্তের, কত সমুদ্রতট, গিরিগহ্বর, অরণ্য উত্তীর্ণ হইয়া কোথায় কোন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া অন্তরের গভীর প্রেমের বিনিময়ে কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট ও কাহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পরম প্রেমিক যোগীবর ব্রহ্মচারী বাবা এই তীর্থে আসিয়া বক্রেশ্বর দেব ও দেবী মহিষমর্দিনীর সেবায় বদ্ধ হইয়াছিলেন! পরমপুরুষ অনাদিনাথ পরমা প্রকৃতি দেবী সিংহবাহিনীর কোনো সুধাময় রসাস্বাদনে মগ্ন হইয়া, ভাব গম্ভীর হৃদয়ে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া, উদার উন্নত মনে প্রেমরসধারা সিঞ্চনে পূর্ণ হইয়া; বিশাল আকৃতি মহাযোগী ব্রহ্মচারী বাবা প্রাতে স্নাত বিমলস্নিগ্ধভাবে বিভোর অন্তরে, পবিত্র অমৃতাপ্লুত হইয়া, বিনয় নম্র নত হইয়া, পুষ্প আধারে সদ্য আহৃত ফল-ফুল সম্ভারে শোভিত হইয়া, দেব উদ্দেশ্যে অর্ঘ দান করিতেন।

ব্রহ্মচারী বাবা রাত্রি প্রভাত হইবার বহু পূর্ব হইতে ধীর স্থির আসনে, স্তিমিত নয়নে আসীন থাকিয়া, কোন ধ্যানে নিমজ্জিত রহিয়া, অচঞ্চল মনে শুদ্ধ হইয়া, কোন্ অপরূপের রূপ চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। দেবাদিদেব বিশ্বরূপ, দেবী বিশ্বম্ভরী মাতার অত্যাশ্চর্য রূপ মাধুর্যে তিনি মুগ্ধ রহিতেন। মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়ের স্মরণে আদ্যাশক্তি মহাকালীর চরণকমলে আত্মনিবিষ্ট

হইয়া, ত্রিকালজ্ঞ উত্তম পুরুষ ব্রহ্মচারী বাবা কালভয় নিবারণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল চিত্তে প্রসন্ন বদনে, উচ্চানন্দ গরিমায় গর্বিত, গভীর আনন্দে তরঙ্গায়িত হৃদয়ে, প্রেমের পরাকাষ্ঠায়, মৃদু মধুর ভাষায় তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন। ব্রহ্মচারী বাবা পবিত্র অন্তরে, সৎ সেবায় যুক্ত নির্মল শুদ্ধকায়া, বিশ্বাধারে আত্ম নিমজ্জিত হইয়া, এই চিন্ময় ধামে অপ্রকৃত দেহ ধারণ করিয়া, দেব দেবীর প্রতি গভীর প্রণয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় গর্বিত না হইয়া হৃদয়মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শুদ্ধ আধারে তিনি বিচরণ করিতেন। কালাতীত মহাকাল জগমনোমোহিনী মহাকালী তাঁহার মনোময় কোষ অধিকার করিয়া এক অলৌকিক বিশ্বানন্দে তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া রাখিতেন। ব্রহ্মচারী বাবা সদাশিবে ও সর্বমঙ্গলার শুভ আশিস নত শিরে ধারণ করিয়া সেই কমল চরণ নিত্য স্মরণে পবিত্র দেহাধারে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব দেশে কোটকাঙ্গরা নামক স্থানে ব্রহ্মচারী বাবার পূর্বাশ্রম জন্মভূমি ছিল। তাঁহার গৃহে দেবসেবা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধনীর গৃহে অতিথিগণের সদাব্রত দিবার ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যাকালে গৃহদেবতার আরতি ও ভোগ সমাধা হইয়া গেলে বহিরাগত কোন সাধু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সে-দ্বারে অতিথি হইলে সেবার জন্য কোন সামগ্রী সে দিন আর পাইতেন না।

ঘটনাক্রমে একদিন সন্ধ্যাআরতির পর পাঁচজন সাধু তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় দেবালয়ে ব্রহ্মচারী বাবা উপস্থিত থাকার নিমিত্ত সেই সাধুগণ তাঁহার নিকট সেবা প্রার্থনা জানাইলেন। তখন তিনি সদাব্রত দানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"এই সাধু অতিথিগণের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

তদুত্তরে কর্মচারী বলিল "আমি আদেশ পালক কর্মচারী। নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অধিকার আমার নাই।"

তখন ব্রহ্মচারী বাবা একটি ছোট কাগজে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধ্য ভ্রাতাকে পূর্ব নিয়ম পালন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বাবা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এই বিষয় সম্পদ থাকিতে যদি আমি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে না পারি তবে আমার এ সংসারে থাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তাঁহার হস্তে একটি সুবর্ণ নির্মিত অঙ্গুরী ছিল, তিনি কর্মচারীকে উহার বিনিময়ে সাধুগণের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন।

মনের দুঃখ ও বৈরাগ্য ভাবের উদয় হওয়ায় ব্রহ্মচারী বাবা তৎপরদিন অতি

প্রত্যূষে নিজ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। গৃহত্যাগের সময় সংসারে তাঁহার অপর তিন সহোদর ও মাতা জীবিতা ছিলেন। তিনি ধনী ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বাল্যাবস্থায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন।

গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীবাবা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয় পর্বত অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় বিচরণ কালে জনৈক স্থবির গুহাবাসী তপস্বীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরু স্থানে অল্পকালই ছিলেন, শীঘ্রই গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় অনির্দিষ্ট ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ঘুরিবার সময় তিনি কোন সাধু বা অন্য কোন লোকের সঙ্গ ভালবাসিতেন না। তিনি অধিক সময় একাই বিচরণ করিতেন।

ব্রহ্মচারীবাবাকে তাঁহার গুরু বলিয়াছিলেন, "হিমালয় তোমার কর্মস্থান নহে। বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করিও; পরে আপনা হইতে কর্মস্থল জানিতে পারিবে।"

ব্রহ্মচারী বাবা গুরুর নিকট বিদায় লইয়া হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কিছু-কাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপভাবে একক পর্বত পরিক্রমা করিতে করিতে একদিন কোন গভীর অরণ্যে সন্ধ্যা হইয়া যায়। গ্রাম বা পথের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ঘন জঙ্গলে হিংস্র পশুর উপদ্রব রহিয়াছে তিনি তাহা বুঝিলেন। সন্ধ্যার পর নিরুপায় হইয়া তিনি এক বৃক্ষোপরি উঠিলেন। উচ্চ বৃক্ষের উপর সমস্ত রাত্রি একা যাপন করা অসুবিধা বুঝিয়া নিজ দেহ বস্ত্র দ্বারা তরু শাখায় বদ্ধ করিয়া পতনের সম্ভাবনা হইতে শরীর রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যার পর ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রী বৃক্ষতলে আসিয়া গর্জন করিতে থাকে এবং লম্ফ দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধরিবার চেষ্টা করে। তিনি উচ্চ শাখায় বদ্ধাবস্থায় ছিলেন সেই কারণে তাঁহার কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিনি তথা হইতে যাত্রা করিয়া গ্রামের সন্ধানে নিরাপদে পথ অতিক্রম করিলেন।

হিমালয়ে স্থিত সন্ন্যাসিগণের আবাসস্থান উত্তরকাশী তীর্থে কিছুকাল ব্রহ্মচারী বাবা আনন্দে কাল কাটাইয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি হৃষীকেশ, হরিদ্বার, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তিনি কাশীতে আসিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর সেইখানে তীর্থ বাস করেন। সন্ন্যাসীদের আশ্রমে তাঁহাদের তিনি সেবা পরিচালনা করিতেন ও তথায় বাস করিতেন।

ব্রহ্মচারীবাবা কাশীতে থাকাকালে প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে

বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মাতা দর্শন করিয়া, দেবালয়ের এক প্রান্তে প্রায় দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত আত্মকর্ম্মে যুক্ত থাকিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট রহিতেন। নিত্য বৈকালে একাকী গঙ্গাতীরে মুক্তবায়ু সেবন করিতেন এবং একান্ত স্থানে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। সন্ধ্যার পর পর্যন্ত তিনি ঐ অবস্থায় একাকী থাকিয়া নিজ আবাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন। তিনি কোন গভীর চিন্তায় আন্‌মনা হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। জলের ঢেউ যত চঞ্চল হইয়া তাঁহার নিকট আসিত যাইত নিজ মনকে ব্রহ্মচারীবাবা তাহার সহিত ভাষাইয়া দিয়া ততই উদাস প্রাণে বসিয়া থাকিতেন। জীবনের কি কর্তব্য, কোথায় তাহার স্থিতি হইবে প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উদিত হইত। কোনো নির্দিষ্ট মীমাংসায় না আসিলেও, নিজ ধর্মাচরণে তিনি তিলমাত্র বিচ্যুত হইতেন না।

কাশীতে কিছুকাল থাকিবার পর বিশ্বনাথের আদেশে তিনি বঙ্গদেশে রাঢ়খণ্ডে বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মচারীবাবা বক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া প্রথমে চন্দ্রসাগরের দক্ষিণ পূর্বকোণে এক কুটির নির্মাণ করাইয়া তথায় প্রায় একমাস ছিলেন। এই গৃহ নির্মাণ করিতে গ্রামের সেবায়েত সুরেন্দ্র চক্রবর্তী, গুরু দয়াল আচার্য গঙ্গা নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পরে ব্রহ্মচারী বাবা দেউলে বক্রনাথ মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণাংশে যে স্থান নিম্ন ছিল তাহাকে উচ্চ করিয়া গাঁথাইয়া, উপরে টালির আচ্ছাদন দেওয়াইয়া বাসোপযোগী আসন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইসবপুরের লালারা, তাঁতিপাড়ার ভক্তরা সাল ও তাল কাষ্ঠ টালি ইত্যাদি ইহার নিমিত্ত দিয়াছিলেন। উচ্চ আসনের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিতে ঐ টালি ও কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল। মেঝেটি সুচিক্কণ করাইতে বহুপ্রকার দ্রব্য একসঙ্গে মিশ্রিত করানো হইয়াছিল। মেঝে নির্মিত হইলে তাহার উপর তদানীন্তন রাণী ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকার ছাপ দেওয়া হইয়াছিল।

এই স্থানে তিনি সকল সময় থাকিতেন এবং ভক্তগণ সকলে উক্ত স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। নব নির্মিত স্থান 'ব্রহ্মচারীর দাওয়া' নামে অভিহিত হয়।

প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মচারী বাবার মস্তকে দীর্ঘ সরু সরু তাম্রবর্ণ জটা ও কৃষ্ণ বর্ণ শ্মশ্রু ছিল। সেইগুলি একত্রে জড়াইয়া শিরোপরি বাঁধিলে অতি উচ্চ চূড়ার মত দেখাইত।

ব্রহ্মচারীদের ন্যায় কমলারঙে রঞ্জিত বসন ও গাত্রাচ্ছাদন হিসাবে তিনি ব্যবহার করিতেন।

দীর্ঘকায় ব্রহ্মচারী বাবার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়, উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষ, সুচিক্কণ ওষ্ঠযুগ, সুগঠিত হস্তযুগ তাঁহাকে লোকোত্তর মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। এই বীর উদার মুক্ত পুরুষ বহুকাল এই তীর্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শিরে দীর্ঘ তাম্রবর্ণ বিভিন্ন গ্রন্থিযুক্ত জটা সুশোভিত হইত।

ব্রহ্মচারী বাবার মহৎ উন্নত ভাব, প্রফুল্ল সহাস্য বদন, মৃদু মধুর বচনে তিনি সকলের সহিত মিলিত হইতেন এবং সকলকে মুগ্ধ করিতেন। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বল্পবাক্যে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। তিনি বালকগণের সহিত অল্প মধুর বাক্যালাপে বা তাহাদের হস্তে আহার্য দ্রব্য দিয়া উল্লসিত করিতেন।

গ্রামের বালকগণ ব্রহ্মচারী বাবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তিনি তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হস্তের মুষ্টি করিয়া খেজুর বাদাম পেস্তা বালকদের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। বালকগণ মহানন্দে তাহা সংগ্রহ করিয়া সেবা করিত। তিনি প্রসন্ন হৃদয়ে তাহাদের আনন্দ কোলাহল দেখিয়া হাসিতেন।

সময় সময় টাকা ভাঙ্গাইয়া বালকদের মধ্যে তাহা ছড়াইয়া দিতেন। বালকদের তাহা সংগ্রহ করিবার ঔৎসুক্য দেখিয়া হাসিতেন ও আনন্দ অনুভব করিতেন।

বহিরাগত সাধু সন্ন্যাসীবর্গ এই তীর্থে আসিলে ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাদের সেবা করাইতেন এবং প্রয়োজন বোধে যেরূপ বুঝিতেন তদ্রূপ বহির্বাস তাঁহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিতেন।

দেহের অনুপাতে ব্রহ্মচারী বাবার হস্তপদ দীর্ঘ ও কোমল ছিল। জটা মুণ্ডনের পর তাঁহার কেশ ও মুখরোম আরও দীর্ঘ দেখাইত।

সূর্যকুণ্ডের পশ্চিমভাগে পাপহরার তীরে উত্তর অংশে ব্রহ্মচারী বাবা একটি ইষ্টক নির্মিত ক্ষুদ্রাকার ঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তথায় তিনি স্নানার্থে যাইতেন এবং নিজ কেশগুচ্ছগুলি বেসন দধি দ্বারা পরিষ্কার করিতেন। তাঁহার দেহ ও বেশভূষণ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিবার তিনি চেষ্টা করিতেন। স্নানের ঘাট তিনি ব্যবহার করায় সে স্থান সর্বদা নির্মল থাকিত।

বক্রেশ্বরদেব ও দেবী মহিষমর্দিনীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেব দেবীর প্রীত্যর্থে তিনি পুষ্প ও ফলের অর্ঘদানে আনন্দ অনুভব করিতেন। সাত-ঘেটেল নামক পুষ্করিণীর চতুর্ধারে পাপাহরা নদীর পূর্ব দক্ষিণ ভাগে চড়কতলা বা বড় বাগান নামক স্থানে আম-জাম-নারিকেল-কদলী-লিচু-কুল-বেল প্রভৃতি ফলের গাছ তিনি রোপণ করাইয়াছিলেন। পাপহরার উত্তর পূর্বভাগে গোলাপ,

চামেলী, বেলি, জবা, করবী, গুলঞ্চ, মালতী প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পের বৃক্ষলতা যত্ন পূর্বক তিনি রোপণ করাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতিদিন প্রাতে বিল্বপত্র পুষ্প ও ফলের অর্ঘদান করিয়া পরে ভক্তগণ মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে দেবতাকে নিবেদিত সুপক্ক বিল্বের মিষ্ট তরল পানীয় তিনি প্রার্থিগণকে পান করাইতেন।

দেউলের উত্তরে পুষ্করিণীর তীরগুলি হইতে এবং দক্ষিণে পাপহরার তীরে চড়কতলা (পরে বড় বাগান নামে খ্যাত) উদ্যান হইতে প্রাপ্ত বস্তু ব্রহ্মচারীবাবা দেবতাকে অর্ঘ দিয়া নিজ অন্তরের প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় দিতেন। বক্রনাথ ও মাতা মহিষমর্দিনীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রণয় বন্ধন ছিল। দেবতাগণ ব্রহ্মচারী বাবাকে তৎ বিনিময়ে সর্বতোভাবে সুখী করিয়াছিলেন। এই তীর্থ ত্যাগ করিয়া তিনি বাহিরে কদাচিৎ যাইতেন। প্রীতির সেবাই তাহার সাধন জীবনে একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

ব্রহ্মচারী বাবার লক্ষ্য ছিল কিরূপে দেব দেবীকে প্রতিদিন প্রাতে ফুল ফলের অর্ঘদানে পূজা করিবেন। ইহাই তাঁহার জীবনে অপূর্ব আনন্দ দান করিত।

প্রাতে তিনি নিত্য কৃত্য সমাধা করিয়া এক খণ্ড মিছরি মুখে দিতেন, তৎপরে পুষ্পাধার লইয়া পুষ্প চয়নে বাহির হইতেন।

বক্রেশ্বর দেব এবং দেবী মহিষমর্দিনীর এস্থানে মধ্যাহ্নে নিত্য পরমান্ন ভোগ হইত। তিনি ঐ প্রসাদ তীর্থবাসী প্রত্যেক সাধুকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট সেবায়েতগণকে গৃহে লইয়া যাইতে দিতেন। তিনি দেব সেবা ও ঐরূপ প্রসাদ বণ্টন করিয়া অন্তরে গভীর আনন্দ উপভোগ করিতেন। যে-সময়ের যে-ফল, আম, জাম, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রাতে বা বৈকালে তাহা দেবতার নৈবেদ্যে নিবেদিত ও বিতরিত হইত।

ব্রহ্মচারী বাবা ফল ও ফুলের গাছ অতি যত্নে যাহা রোপণ করিয়াছিলেন, সুপক্ক ফল সেই বৃক্ষতলে পতিত থাকিলে কোন পথচারী তাহা দেখিতে পাইলে, ফলটি আহরণ করিয়া ব্রহ্মচারী বাবার নিকট লইয়া যাইত। তিনি ঐ ফল দেব দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া, তাহার কিয়দংশ বিতরণের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সংগ্রাহক আগন্তুকের হস্তে দিয়া তাহা'ক বিদায় দিতেন।

কেহ প্রভুর সেবার জন্য দুধ ফল মিষ্ট দ্রব্য কিছু আনয়ন করিলে ব্রহ্মচারী বাবা ঐ দ্রব্যগুলি প্রভুকে নিবেদন করিয়া কিঞ্চিৎ নিজের কিংবা ভক্তগণের নিমিত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিতেন।

উদ্যান রক্ষা করিতে তাহার মধ্যভাগে রক্ষকের জন্য কুটীর নির্মাণ করাইয়া-

ছিলেন। ফুল গাছে জল সিঞ্চন ও যত্ন করিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া উপবনে একশতআটপ্রকার ফুল গাছ এবং সকল ঋতুর ফলের গাছ রোপন করাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীবাবা পৌষ মাসে পৌষল এবং রথ যাত্রার সময় অনেক লোককে যত্নের সহিত সেবা করাইতেন।

দেবী মহিষমর্দিনী মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ও বটুক ভৈরব মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মচারীবাবা দেবাদিষ্ট হইয়া নূতন মন্দির নির্মাণ করাইয়া সন্ন্যাসীদের গুরু দত্তাত্রেয় স্বামীর চরণ চিহ্ন সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গাব্দ ১২৯৫ সালে এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতেই তাঁহার চরম গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ চরণ চিহ্নের পার্শ্বে নারায়ণের চরণ যুগল পরে স্থাপিত হইয়াছে। এই মন্দির প্রতিদিনই ধৌত হয় এবং সেবায়েতগণ তথায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধূপ প্রদীপ নিয়মিত দিয়া থাকেন।

এক সময় এস্থান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে হেতমপুর রাজবাটিতে যাইয়া রাজাকে ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন, "আমি আপনার নিকট হইতে কয়টি ফুল গাছ সংগ্রহ করিতে পারিব এই ভরসায় আসিয়াছি।"

রাজা উত্তর দিলেন, "আপনার যে-বৃক্ষলতা মনোমত হয় আপনি তাহাই লইয়া যাইতে পারেন।"

রাজোদ্যান হইতে তিনি আবশ্যকমত বৃক্ষাদি লইয়া গিয়া বক্রেশ্বর উদ্যানে রোপণ করাইয়াছিলেন।

পাপহরার দক্ষিণাংশ, উপস্থিত বড় বাগান নামে খ্যাত ঐ স্থানটি পূর্বে চড়কতলা নামে অভিহিত হইত। ঐ স্থানে এক শিবলিঙ্গ অযত্নে মৃত্তিকাচ্ছাদিত রহিয়াছে। পূর্বে চৈত্র মাসে ঐ স্থানে চড়ক গাছ বসিত এবং শিবরাত্রির সময় প্রধান মন্দিরে পূজা বন্দনা ও মেলা হইত। কালে চড়কতলায় পূর্বের ন্যায় উৎসব মেলা ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যায়।

ব্রহ্মচারী বাবা চড়ক তলার শিবলিঙ্গ উদ্ধার করিতে কয়জন লোক নিযুক্ত করিয়া, বহু নিম্নভাগ পর্যন্ত মৃত্তিকা খনন করাইয়াছিলেন। লোকগুলি যত নিম্নে খনন করে, শিবলিঙ্গের আয়তন নিম্নভাগে ততই বর্ধিত হয়। ঐ শিবলিঙ্গের নিম্নভাগ ক্রমে বৃহদাকার হইতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বাবা সকলকে এই কার্যে নিরস্ত করিয়া পুনরায় শিবলিঙ্গকে মৃত্তিকাচ্ছাদিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ঐ শিবলিঙ্গ উদ্ধার করিয়া ধামের এক স্থানে অপর শিবলিঙ্গের সহিত তাহা রক্ষিত

হইবে। তথায় থাকিলে ঐ স্থানে শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা হইতে পারিবে কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ভক্তগণ সন্ধ্যার পর এক প্রহর বা কিঞ্চিদধিক রাত্রি নয়টা দশটার পর ব্রহ্মচারী বাবার নিকট হইতে বিদায় লইলে, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া রাত্রির অবশিষ্টকাল নিজ আসনে স্বকর্মে যুক্ত থাকিতেন।

অবসর সময় সন্ধ্যাকালে সেবায়েত ও ভক্তগণ ব্রহ্মচারী বাবার আসনের চতুষ্পার্শ্বে বসিতেন। সদালাপের সঙ্গে তিনি কখনো কখনো রুচিকর আহার্য বস্তু ভক্তদিগকে সেবা করাইতেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে কয়টি ভক্ত মিলিত হইয়া ব্রহ্মচারী বাবার নিকট বসিয়াছিলেন। কোনো ভক্ত ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিলেন, "বাবা! সিউড়ির সন্নিকটে করিধ্যা গ্রামে এক বিখ্যাত মোদকের দোকানের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আমাদের সেবা করান।"

তিনি বলিলেন, "তোমাদের সন্দেশ ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা?" ভক্তগণ বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা!"

সেই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মচারী বাবা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া তাঁহার মস্তক আচ্ছাদিত করিলেন। অল্পকাল পরে তাঁহার মস্তক আবরণ মুক্ত করিয়া আবৃত আধার হইতে উৎকৃষ্ট সন্দেশ লইয়া উপস্থিত ভক্তগণকে পূর্ণোদর সেবা করাইলেন।

দুই তিন দিন পরে কোন ভক্ত কর্ম উপলক্ষে সিউড়ি গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি করিধ্যা গ্রামে যে প্রসিদ্ধ মোদক ছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দুই দিন পূর্বে সন্ধ্যার সময় তোমার দোকান হইতে কি কেহ সন্দেশ লইয়া গিয়াছিলেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া মোদক উত্তর দিল, "ব্রহ্মচারী বাবা মিষ্টদ্রব্য লইয়া গিয়াছিলেন।"

ইহা শুনিয়া তাঁহার লোকাতীত শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তাঁতিপাড়া নিবাসী উদয় গোস্বামী নামক এক ভক্ত ব্রহ্মচারী বাবার নিকট নিয়মিত আসিতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মনের দুঃখের কথা এক সময় উক্ত ভক্ত ব্রহ্মচারী বাবার নিকট প্রকাশ করেন।

কিছুকাল পরে ব্রহ্মচারী বাবার কৃপায় তিনি এক কন্যা লাভ করেন। কন্যা জন্মের পর ভক্ত আসিয়া বলিলেন, "বাবা! আপনার আশীর্বাদে আমার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীবাবা উত্তর দিলেন, "ভাল হইয়াছে, পুত্র কন্যা দুই

সমান।" ফলে ঐ কন্যার বহু সন্তান সন্ততি হইয়া এক বৃহৎ পরিবার স্থাপিত হইয়াছে।

গোয়ালিয়ারা গ্রামের ভক্তিমতি এক ব্রাহ্মণী মাতা মধ্যে মধ্যে বক্রেশ্বর সাধুদের নিকট দর্শনেচ্ছায় আসিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সেবার নিমিত্ত কিছু সামগ্রী প্রদান করিয়া চলিয়া যাইতেন। একদিন ঐ ব্রাহ্মণী তাঁহার বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বক্রেশ্বর আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা ঐ সময় পাপহরা নদী তীরে উত্তর ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রাহ্মণ বালককে দেখিয়া তিনি তাহার হস্তের একটি বলয় খুলিয়া লইয়া পাপহরার জলে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

এইরূপ আচরণে ব্রাহ্মণ বালক নিজ হস্তের বলয়টির জন্য রোদন করিতেছিল। বালকের রোদন শুনিয়া ব্রহ্মচারীবাবা জলের তীরে এক হস্তের কয়টি অঙ্গুলি জলে ডুবাইয়া যেন কিছু আকর্ষণ করিতেছেন—ক্ষণিকের নিমিত্ত এই ভাব করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে জলে নিক্ষিপ্ত বলয় তাঁহার হস্তগত হইল। বালকের হস্তে সেই বলয় পুনরায় ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন বালক ক্রন্দন সম্বরণ করিল।

গোয়ালিয়ারা গ্রামের মনীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ১২৮৯ সালে ব্রহ্মচারী-বাবা প্রথম নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে এক পুত্রের জন্ম হয়, তিনি ষষ্ঠ দিবসে এক মুদ্রা দিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া আসেন।

উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্যামা পূজা হইত। ব্রহ্মচারীবাবা রাত্রি বারটা একটার সময় গোয়ালিয়ারা গ্রামে যাইয়া পূজা দর্শন করিয়া, পূজা সমাধা হইলে নিজ আসনে ফিরিয়া আসিতেন। রাত্রিতে তাঁহাকে প্রসাদ সেবা করিতে বলিলে, তিনি কখনও ঐ সময় কিছু গ্রহণ করিতেন না।

এক সময় উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৃহ নির্মিত পিষ্টক একটি পাথর বাটিতে করিয়া বক্রেশ্বরে ব্রহ্মচারীবাবাকে সেবার জন্য দিয়া যান। পরে ঐ পাথর বাটি লইতে আসিলে ব্রহ্মচারী বাবা বলিলেন, "পাথর বাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

কিছুকাল পরে এই তীর্থে শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলার সময় ব্রহ্মচারীবাবা ছয়টি পাথরবাটি ক্রয় করিয়া উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সেগুলি লইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করেন।

ব্রহ্মচারী বাবা ঘৃতে সিদ্ধি ভাজিয়া মিষ্টি দিয়া রাখিয়া দিতেন। উক্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নিকট কখন আসিলে দুই খণ্ড তাহার হস্তে দিয়া বলিতেন "এই মিষ্টি দ্রব্য স্বল্পপরিমাণে সেবা করিবে নতুবা তোমার নেশা হইবে।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাক্য পালন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

দ্বাদশ বর্ষ পরে সাধুদের নিজ জন্মভূমি দর্শনে যাইবার রীতি রহিয়াছে।

তদুদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারীবাবা এই স্থান হইতে দুইজন সেবায়েতকে সঙ্গে লইয়া সাঁইথিয়া ষ্টেশনে পদব্রজে গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বরেন চক্রবর্তী নামে এক সেবায়েতকে বলিলেন, "আমার নিজ গৃহের জন্য মন চঞ্চল হইতেছে আমি সাঁইথিয়া হইতে বক্রেশ্বর ফিরিয়া যাইব।"

ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাকে বিদায় দিয়া অপর সেবায়েত বিহারীলাল চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে ট্রেন যোগে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাব দেশে নিজ জন্মভূমিতে উপস্থিত হইয়া পৈত্রিক দেবালয়ে উভয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

তথায় এক প্রাচীন কর্মচারী ব্রহ্মচারী বাবার মুখ দেখিয়া, তাঁহাকে সংসার ত্যাগী মধ্যম বাবু বলিয়া চিনিতে পারিয়া, বাটীস্থ সকলের নিকট কথা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারী বাবার জ্যেষ্ঠ সহোদর সকল পরিচয় ও পূর্ব সম্বন্ধ সত্য জানিয়া দীর্ঘকাল পরে পুনর্মিলন হওয়ায় সপরিবারে প্রীত হইয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার পূর্বগৃহে তিন সহোদর ও মাতা জীবিতা ছিলেন। পূর্বাশ্রমের সকলে প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মচারী বাবাকে অর্থ সাহায্য পাঠাইবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, তিনি গৃহ হইতে কিছু লইতে অস্বীকার করেন।

ব্রহ্মচারী বাবা দেবালয়ে তিন রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি চতুর্থ দিবস গৃহ হইতে সকলের নিকট বিদায় লইলে সে বাটিতে করুণ রোদন উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারী বাবা অবিচলিত চিত্তে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেবগৃহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় বক্রেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ সেবায়েত সুরেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার পাচক ছিলেন। তিনি বক্রেশ্বর দেবালয়ের দক্ষিণে ধুনি ঘরে বসিয়া পাক করিতেন। ব্রহ্মচারী বাবা পেঁয়াজ সেবা করিতেন না। তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ পেঁয়াজ বাটিয়া তাহার রস একদিন তরকারীতে দিয়াছিলেন। তাহা সেবা করিয়া তাঁহার মুখরোচক হওয়ায় তিনি পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য তরকারী বেশ সুন্দর হইয়াছে, তুমি এই ভাবে পাক করিও। তুমি ইহাতে কি দিয়াছ?"

পাচক উত্তর দিলেন, "রাম লাড্ডু দিয়াছি।"

ব্রহ্মচারীবাবা হাসিয়া উঠিলেন। এই ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীবাবাকে পেঁয়াজ খাইতে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে এক ভক্ত ব্রহ্মচারীবাবাকে কৌটায় করিয়া উৎকৃষ্ট গাঁজা এবং অন্যান্য প্রিয় খাদ্য ডাকযোগে পাঠাইতেন।

শুনা যায় ব্রহ্মচারী বাবার এই আনন্দময় জীবনে অকস্মাৎ কোনরূপ মানসিক

অশান্তি ঘটায় তিনি এক পক্ষ মৌন ভাবে কাটাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা যেদিন দেহরক্ষা করেন তৎপূর্বদিবসে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট কয়জন ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দিবাভাগে তাঁহাদের অনুরোধে ছাগবলি দিয়া মধ্যাহ্নে সেবা করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দিবসের সেবা সমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়া যান। তন্মধ্যে মুক্তিপুর গ্রামের হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালিয়ারা গ্রামের রাম রায়, হরি ঘোষাল, বনোয়ারী দত্ত, বক্রনাথ চক্রবর্তী, ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, রাত্রিতে ব্রহ্মচারী বাবার আদেশে তাঁহার নিকট রহিলেন।

তাঁতি পাড়ার উদয় গোস্বামী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের রাত্রিতে সেবার জন্য লুচি পোলাও সন্দেশ প্রভৃতি তাঁত পাড়ার মোদকের দোকান হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন।

সে সময় দেবী মহিষমর্দিনার সম্মুখে খড়ের আচ্ছাদিত নাটশালা ছিল। ভক্তরা সকলে তথায় শয়ন করিতে গেলেন। বক্রেশ্বর গ্রামের ইকু বাগ্দী তাঁহাদের নিকটেই রহিল।

রাত্রিতে সেবার পর সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। উদয় গোস্বামী 'দাওয়ার' উপর ব্রহ্মচারী বাবার আসনের পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন।

সকলে শয়ন করিলে ব্রহ্মচারী বাবা নিজ আসনে উপবিষ্ট রহিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর বারোটা সাড়ে বারটার সময় ধ্যানস্থ কালে তিনি অকস্মাৎ আসন হইতে পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িয়া যান। পতনের শব্দ পাইয়া উদয় গোস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দ্রুত শয়ন হইতে উঠিয়া তিনি দেখিলেন ব্রহ্মচারী বাবা আসনের পার্শ্বে পতিত রহিয়াছেন। এইরূপ দেখিয়া গোস্বামী, "বাবা, বাবা" বলিয়া কয়েকবার ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায় সকলকে ডাকিলেন। খড়ের চাল নাটশালার নিম্নভাগে যাঁহারা শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সত্বর ব্রহ্মচারী বাবার নিকট আসিয়া দেখিলেন তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী বাবার দেহান্তের পর তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বক্ষের উপর ছিল এবং স্থির আসনে ধ্যানে উপবিষ্ট থাকা কালে একটি পদ শেষ অবস্থায় পদ্মাসনের ন্যায় রক্ষিত ছিল।

রাত্রিতে বক্রেশ্বর গ্রামে সংবাদ দেওয়া হইল। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া গ্রাম হইতে প্রবীণ ব্যক্তিগণ কেহ কেহ আসিয়া ব্রহ্মচারী বাবার সাধন মুক্ত-দেহের সৎকার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরদিন প্রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে সংবাদ যাওয়ায় ভক্তগণ অন্তিম শয্যায় শায়িত ব্রহ্মচারী বাবাকে শেষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁতিপাড়ার উদয় গোস্বামী ও তাঁহার ভগিনী সমাধি দিবার সময় সে কার্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারী বাবার হস্তে সহস্র মুদ্রার এক হীরক শোভিত অঙ্গুরী ছিল। কেহ কেহ এইরূপ আকস্মিক দেহান্ত হওয়ায় অনুমান করেন তিনি ঐ হীরক লেহন করিয়া নিজের দেহান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে আরও দুইটি স্বর্ণ নির্মিত অঙ্গুরী ছিল।

ব্রহ্মচারী বাবার দেহান্ত হইলেও তাঁহার সর্বাঙ্গ অবিকৃত অবস্থায় শায়িত ছিল। সে দেহ দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ববৎ উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি অর্ধ উন্মীলিত শিবনেত্রে স্থিত ছিল; যেন তখনও গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার স্থির নেত্রদ্বয় শান্ত সৌম্যমূর্তি, সুন্দর বদন হৃদয়ের কোন গভীর আনন্দে বাহ্যে প্রকাশ করিতেছিল। সেস্থানে কালিমার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রাণহীন দেহ সকলি অসাড় হইয়াছে, কিন্তু বহিভাগে মনে হইতেছে কোন অনির্বচনীয় সুখানন্দে মগ্ন থাকা কালে সেই যোগনিষ্ঠ উপাসকের শরীর ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়াছে। পূর্বে যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাগত হইয়া দেহ মন প্রাণ দিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, তিনি শেষাবস্থায় গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়া মহাকালের কৃপায় মরণ যাতনার কুক্ষিগত হন নাই। তিনি জীবদ্দশায় সে আনন্দ অন্তিমে সমভাবাবস্থায় পরমানন্দের চরম শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই সিদ্ধ দেহের সুখময় জীবনের অপরূপ অমৃতত্বের প্রকাশ।

ব্রহ্মচারী বাবার জীবদেহ সৎকার হইয়া যাইবার অন্তে পরদিবস লুচি ফলাহার করান হইয়াছিল। তাঁহার দেহান্তের সংবাদ পূর্বাশ্রম গৃহে দেওয়া হইয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার এক ভগিনী বক্রেশ্বর আসিয়া দুই মাস বাস করিয়াছিলেন। ১২৯৮ সালে ব্রহ্মচারী বাবা দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্য কুণ্ডের পশ্চিমভাগে ব্রহ্মচারী বাবার দেহাবশেষ সমাধিস্থ হয়। পরে খাকি বাবা ঐ সমাধির উপরিভাগ প্রস্তরদ্বারা কিছু অংশ গাঁথাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচারী বাবার সমাধির উপর অংশ সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায় লেখক এক সময় করিয়াছিল। এইরূপ কৃত সঙ্কল্প হইয়া এ বিষয়ে স্থির ভাবে চিন্তা করিবার সময় লেখকের মনোমধ্যে নিম্নলিখিত ভাবের উদয় হইয়াছিল। মনোমধ্যে যেন ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেছেন, "আমার প্রাণ ঐ গুরুর চরণে সমর্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ দত্তাত্রেয় স্বামীর চরণ চিহ্ন যাহা নূতন মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে, তথায় রহিয়াছে। এই নশ্বর দেহের জন্য সমাধির উর্ধ্বভাগে কিছুই করিবার

প্রয়োজন নাই।" সেই অনুসারে লেখক ব্রহ্মচারী বাবার অর্ধসমাপ্ত সমাধি আচ্ছাদিত করিতে নিরস্ত হইয়াছে।

আজ যাহা বর্তমান, কালের কবলে পড়ে সকলই অন্তর্হিত হইতেছে। যাহার সহিত মধুর মিলনে অপূর্ব মহানন্দ লাভ করা যায় তাহার অবর্তমানে সমস্ত শূন্য বোধ হইতে থাকে। সে মনুষ্য নাই তাহার প্রিয় সঙ্গ নাই; সদালাপ, উচ্চহাস, প্রেমিকের প্রণয়বিহ্বল রসভঙ্গিমা নাই; প্রেম মিলনাভিলাষী অন্তরঙ্গের সমাগম নাই; নবআহৃত পুষ্পার্ঘের সম্ভার দেবোদ্দেশ্যে নিবেদনের উৎসাহ নাই। পুষ্পোদ্যানে তরুলতা প্রিয় মিলন অভিসারে নিত্য আগতের অবিদ্যমানে, প্রেমলুব্ধ ব্রহ্মচারী বাবার অদর্শনে তাহারা সকলে বিরহে মুহ্যমান রহিয়াছে।

নীলকণ্ঠ মরণজয়ী মহাকাল বক্রেশ্বরদেবের এবং অর্ঘনাশিনী শত্রুদলনী দশভূজা মহিষমর্দিনীর অশেষ অনুগ্রহভাজন সেই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মচারী বাবা জীবদেহ ত্যাগ করিয়া কোন্ অনন্তলোকের যাত্রী হইয়া গিয়াছেন, আজ সে নির্ণয় করিবার জন্য কোন্ অনুরাগী অনুসন্ধিৎসু পুরুষ এক্ষেত্রে আছেন বা আসিতেছেন? নরদেহ ধারণ করিয়া তত্ত্বদর্শী অন্তর্নিহিত মহামানব ব্রহ্মচারী বাবা যে-জ্ঞান, যে-বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত সুখসঙ্গে আগত জনগণ তাঁহার নিকট কিছুকাল সর্বভাবে সাময়িক আনন্দ লাভে তৃপ্ত হইয়াছিল। সময় গত হইয়াছে, কাল গহ্বরে স্মৃতি বিলুপ্ত হইতেছে, দিনে দিনে অনন্তের ক্রোড়ে সকলই বিলীন হইতেছে। ফুল ফল নৈবেদ্যের নিত্য অর্ঘদানে আত্মহারা প্রেমবিহ্বল ব্রহ্মচারী বাবা চিরনিদ্রান্তে জগৎ হইতে বিদায় লইয়া লোকচক্ষে তিরোহিত হইয়াছেন। আজ কোন্ ব্যথিত প্রাণ তাঁহার উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল বা পুষ্প সামগ্রী তাঁহার সমাধি ক্ষেত্রে সুখ স্মৃতি অনুভবে অর্পণ করিতেছে!

সেই অনাসক্ত দেবানুরাগী প্রেমসেবারত উচ্চাদর্শী ব্রহ্মচারীবাবা কোন দিন সঞ্চয়বুদ্ধি আশ্রয় না করিয়া স্থানোপযোগী সর্বত্যাগী মহাজনের ন্যায় সঞ্চিত সর্বস্ব নানাভাবে বিতরণে উল্লাসবোধ করিয়াছিলেন।

কালস্রোতে ভাসমান হইয়া দেবপ্রিয় ব্রহ্মচারীবাবা মুক্ত শুদ্ধ আধার আসিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি বহু সৎপুরুষের সঙ্গ লাভে আকৃষ্ট হন। তিনি নিজ অকলঙ্ক স্বাভাবিক পবিত্র চরিত্রের মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আত্ম জীবনের সৎসাধনায় সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি অকাতরে সৎজ্ঞান ও সত্যের সন্ধান ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে শান্তি বাক্যে সুখদান করিয়া, ব্রহ্মতেজ ধারণ করিয়া একাগ্র তপস্যারত হইয়া এক অবিনশ্বর চিরমধুর মিলনে সদাজাগ্রত থাকিয়া অকুতোভয়ে বীর অনমনীয় কঠোর দৃঢ়ব্রতী

ছিলেন। তিনি আজ মরণ আলিঙ্গন করিয়া চিদানন্দের অমৃতময় নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। জীবদ্দশার মধুর মিলন, যাহা আজ চিরবিরহে পরিণত হইয়াছে।

যিনি সত্য হইতে আগত, সত্যনিষ্ঠায় যাহার জীবন সুসম্বদ্ধ, যিনি সত্যের অনন্ত কালস্রোতে অন্তর্নিহিত হইয়াছেন, তাহার মধুর স্মৃতি কোনো কোনো শুদ্ধকায় মনুষ্যের অন্তরে কভু আলোড়িত করিয়া যায়।

যেদিন সুরনাথ বক্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের মিলন সুখাভিলাষ সে দেহে পূর্ণ হইল, যে দিন নীলকণ্ঠের কালভেরি বাজিল, যেদিন সতী পতিরতি চির-স্থিত যৌবনা অনন্তবীর্যা মনোরমা আপদনাশিনী দেবী মহিষমর্দিনীর অভয়বাণী শ্রুত হইল, সেই দিন বীর সাধক ব্রহ্মচারী বাবা ইহলোক হইতে অজ্ঞাত অব্যক্ত লোকের যাত্রী হইয়াছিলেন।

চির নিদ্রায় নিদ্রিত, বসুমতীর শান্তিময় ক্রোড়ে ভূমিশয্যায় শায়িত, অনন্ত কালকক্ষে লুক্কায়িত, চিরমরণ সহচর স্মৃতি কভু আগত কভু অনাগত হইয়া, মৃদু করুণাসিক্ত হইয়া, কদাপি কোনো হৃদয়ে ক্ষণ-প্রভাবের ন্যায় স্পর্শ করিয়া যাইতেছে।

খাকি বাবা :—এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে অর্ধশতাব্দীর পূর্বভাগে সুদূর রাজপুতানা দেশে যোধপুর রাজপরিবারে অষ্টমজাতসন্তানরূপে খাকিবাবা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় এই নগ্ন সন্ন্যাসী, কালে যিনি খাকিবাবা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, হিমাচলের কোনো গিরিগহ্বরে উচ্চসাধন করিতে থাকেন। পরে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি আদেশ লাভ করিয়া বাংলার এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ বক্রেশ্বরে বিশুদ্ধ জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র দেবানুগ্রহ লাভে তৃপ্ত না হইয়া তিনি এই পবিত্র চিন্ময়ধামে তীর্থক্ষেত্রের দেব ও দেবীর মাহাত্ম্য লোকসমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারই মুক্ত আত্মার স্মরণে কয়টি ঘটনামাত্র উল্লেখ করিব।

স্থির গম্ভীর মহাযোগী খাকিবাবা নিজ আসনে উপবিষ্ট রহিয়া বাহ্যে অপ্রকাশিত অন্তরযোগে সদাঋদ্ধ থাকিতেন। অন্তর্দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকায় যে কোন অবস্থায় যে কোন বাক্যের সদুত্তর দানে ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের সঙ্কোচ হইত না। রোগী, যোগী, ভোগী তাঁহার সহিত মিলনেচ্ছায় আসিতেন, যে যেরূপ ব্যক্তি বা যে যদ্রূপ প্রয়োজনে আসিত তাহার সহিত তদ্রূপ আলাপ করিয়াই তাহাকে তুষ্ট করিতেন। এইরূপ মধুর ব্যবহারের জন্য খাকিবাবা সকলের প্রিয় ছিলেন।

খাকিবাবা এক মহাত্যাগী উন্নত সন্ন্যাসী নীরব কর্মী উচ্চ অনাসক্ত মহাপুরুষ

ছিলেন। তিনি বাবা বক্রেশ্বরদেব ও দেবী মহিষমর্দিনীর কৃপা পাত্র ছিলেন। এই তীর্থের উন্নতি বিধান বা তীর্থ আগন্তুক যাত্রীদের বহুবিধ শোক দুঃখ নিবারণ কল্পে কখনো কখনো অত্যন্ত বিস্ময়কর শক্তি প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ করিতেন। যোগ্যব্যক্তির দ্বারা দৈবকৃপা প্রকাশিত থাকায় তাহা জীবের কল্যাণেই প্রযুক্ত হইত। নিরভিমানী অনাসক্ত নির্লিপ্ত শ্রেষ্ঠ মানব যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই যে কোন গ্রামে ভক্তদের গৃহে উপস্থিত হইতেন। এই উদার মানব কোথাও সমাদরে বা যত্নে সেবা পাইব এরূপ আশা বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। ভক্তগণের সহিত অতি সরলভাবে বাক্যালাপে কোনো সেবাগ্রহণ না করিয়াই কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। সকলকে নিকট আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহারের দ্বারা প্রীত করিতেন। তিনি কাহারও দ্বারে বা কোনো পবিত্র স্থানে বসিয়া নিজের কোন প্রয়োজনের কথা কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাপূর্বক যে যাহা লইয়া আসিত বা তাঁহার সেবার নিমিত্ত নিবেদন করিত, খাকি বাবা অতি আনন্দে, সাদরে সামান্য জিনিষ হইলেও তৃপ্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া প্রচুর সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এইরূপ অমায়িক স্বভাবের জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট আসিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিনি একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন মুক্ত পুরুষ হইলেও, বহিরাচরণে কোথাও বাক্যে কি ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইত না। তিনি মৃদু মধুর ভাষায় সকলকেই পরিতৃপ্ত করিতেন। কখনো তিনি উচ্চ বা রুক্ষ ভাষায় কাহাকেও তিরস্কার বা কাহারো কথার প্রতিবাদ করিতেন না। ইহাই তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ছিল। অক্রোধী, নিরহঙ্কারী পুরুষ সদাশান্তসৌম্য ভাব ধারণ করিয়া অন্তরের প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় দিতেন। বিবিধ উচ্চ শক্তির আধার হইলেও তাহা কদাচিৎ প্রকাশ করিতেন। নিতান্ত আবশ্যকবোধেই কখন লোক মধ্যে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ হইয়াছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিত। কোন প্রকার অপব্যয় বা অপচয় তাঁহার মনোমত ছিল না। শ্রদ্ধার দান ভিক্ষাদ্রব্য যাহাতে কখনো অপরিমিত ব্যয় না হয় সেবিষয়ে ভাণ্ডারী পাচককে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন।

খাকিবাবা বলিতেন, "যাহা প্রয়োজন সেবা কর বা লোককে সেবা করাও। কিন্তু অনাবশ্যক কোন দ্রব্যের বৃথা ব্যবহার করিবে না। ভিক্ষান্নের মর্যাদা সর্বদাই দিবে।"

খাকিবাবার সেই অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ চরণদ্বয় অতি কোমল ছিল।

মস্তকের কেশ তিনি মুণ্ডন করিতেন। তিনি কোনো দূর স্থান হইতে পদব্রজে আসিলে চরণপ্রান্ত একেবারে পরিষ্কার ও কোমল থাকিত। এরূপ দেখিয়া মনে হইত যেন তিনি হাঁটিয়া আসেন নাই।

খাকিবাবা প্রথম আসিয়া সিউড়ির নিকট করিধ্যা গ্রামে অধিক সময় থাকিতেন, পরে তথা হইতে আসিয়া বক্রেশ্বর তীর্থে বাস করেন।

প্রথমাবস্থায় তিনি যখন করিধ্যা গ্রামে বাস করিতেছিলেন তখন তথাকার সেন পরিবারস্থ কোন বণিকের গৃহে একদা এক মৃতপ্রায় বালক শেষশয্যায় শায়িত ছিল। গ্রামে এক নগ্ন (নাগা) সাধু উপস্থিত আছেন জানিয়া তখন এক বিপন্ন পরিবার এই সাধুর শরণাপন্ন হইল। তাহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া খাকি-বাবা মুমূর্ষু রোগীর নিকট গেলেন। লোকাতীত শক্তিপ্রভাবে রুগ্ন বালকের তিনি অঙ্গস্পর্শ করায় সে জ্ঞান লাভ করিল। মৃতপ্রায় বালককে জীবিত করিয়াছেন, নগ্ন সাধুর এই অসাধারণ অতি অদ্ভুত গুণের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার অতিঅদ্ভুত শক্তির পরিচয় করিধ্যা গ্রামে প্রথম প্রকাশ পায়। সেই অবধি তথাকার সকলে বিশেষ করিয়া সেনপরিবার খাকিবাবাকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। তখন তিনি নগ্ন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এরূপ নগ্ন অবস্থায় লোকালয়ে ঘুরিলে অনেকের সঙ্কোচের কারণ হইবে, এইরূপ বাক্য সাধু বাবাকে বুঝাইয়া বলাতে তাঁহার গলা হইতে পাদমূল পর্যন্ত সেন পরিবারের দ্বারা প্রদত্ত এক দেহাবরণ তিনি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

করিধ্যা গ্রামে থাকাকালে বহু স্ত্রী পুরুষ অবসর সময়ে অধিক রাত্রি পর্যন্ত তাহার নিকট বসিয়া বিবিধ বিষয়ে আলাপ করিত। গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত যুক্তি করিয়া স্থির করে যে, এই সাধু দুশ্চরিত্র, আমরা রাত্রিতে তাঁহাকে বধ করিব। কেবলমাত্র সন্দিহান হইয়া এইরূপ দুরভিসন্ধি লইয়া এক রাত্রিতে কয়জন মিলিত হইয়া খাকিবাবাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার স্থানে আসে। রাত্রিতে খাকিবাবার গৃহের দরজা খুলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুষ্ট মনুষ্যগণ দেখিল যে, গৃহমধ্যে কয় খণ্ডে কর্তিত এক নরদেহ ভূমিতে পড়িয়া আছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা সকলে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। পরদিন প্রাতে যথারীতি খাকিবাবা নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া সেই দুর্বৃত্তগণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া নিজেদের অপকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে।

খাকিবাবা বক্রেশ্বরে আসিয়া প্রথম প্রথম দেউলে একটি গুহায় বাস করিতেন। সে সময়ে কিছুকাল এস্থানের সেবায়েত আচার্য পরিবার হইতে

তাঁহার মধ্যাহ্ন সেবার আহার আসিত। তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল। মাত্র তিনচারগ্রাস অন্নসেবা করিতেন। তিনি প্রাতে কিসমিস, বাদাম, পেস্তা খেজুর, মিছরি সেবা করিতেন এবং রাত্রিতে মাত্র দুই তিনখণ্ড লুচি তিনি খাইতেন। পাচক তাঁহার আহারের সকল ব্যবস্থা করিত।

পাচক যদি কখনও দ্রব্যক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট কিছু চাহিতেন, খাকিবাবা হয়ত নিজাসনের নিকট হইতে এক টাকা লইয়া যাইতে তাহাকে বলিতেন। কিন্তু পরে সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্ধান লইতেন না।

পথিমধ্যে চলিবার সময় কোন ব্যক্তি খাকিবাবাকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে চাহিলে তিনি সেই স্থানে প্রণাম গ্রহণ করিতে দাঁড়াইতেন। দর্শক তাঁহার চরণপ্রান্তে সাধ্যমত মুদ্রা প্রণামীস্বরূপ রাখিয়া দিলে তিনি পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেন। প্রণামীর টাকা যথাস্থানে পড়িয়া থাকিত তিনি তাহা স্পর্শ করিতেন না। এইরূপ অনাসক্ত পুরুষ তিনি ছিলেন।

খাকিবাবা দেশদেশান্তরের নানা ঘটনা বলিতে ও শুনিতে ভাল বাসিতেন। নহবত্খানার পূর্বে শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণপশ্চিম কোণাংশে এক গুহায় তিনি বাস করিতেন। যে সকল লোক তাঁহার নিকট সমাগত হইত, তাহাদিগকে দেশ বিদেশের বিবিধ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার ন্যায় বলিয়া যাইতেন। এইরূপ সংবাদ কথোপকথনে প্রকাশের পর, পরে সংবাদপত্র আসিলে, তাহাতে লিখিত সংবাদ তাঁহার পূর্ব কথিত ঘটনাবলীর বিবরণের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে দেখিয়া সকলে বিস্ময় বিহ্বল হইত। এইরূপ তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল এবং প্রকৃতই তিনি একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন।

এইস্থানে চন্দ্রসাগর নামে যে বৃহৎ জলাশয় গ্রাম হইতে আসিবার পথে উত্তর ভাগে অবস্থিত আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার করিতে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেবায়েত কয়জনের হস্তে অর্থ ও কর্মভার দিয়াছিলেন। প্রতি ঝুড়ি মাটির এক আনা পারিশ্রমিক দিয়াও ঐ কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। শ্রমিকগণের শৈথিল্য ও প্রতারণায়, তত্ত্বধায়কের অমনযোগে কর্ম সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইতে পারে নাই।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে যেরূপ সুযোগ হইত খাকিবাবা পৌষল করাইতেন। কখনো খিচুড়ী কখনো দগ্ধ বেগুন ও মুড়ি, আবার কখনও লুচি মিষ্টান্নও করাইতেন। একবার আটাগুড় মিশ্রিত করিয়া প্রচুর মালপোয়া ভাজাইয়া ভূরিভোজন করাইয়াছিলেন। সে সময় সর্বশ্রেণীর পঞ্চগ্রামী লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন এবং যত্নপূর্বক সকলে সেবা করিয়া যাইতেন।

২০শে পৌষ খাকিবাবার পৌষল করাইবার নির্দিষ্ট দিন ছিল। পৌষলের সময় আগন্তুকগণের মধ্যে কেহ কেহ বড় বেগুন আনিয়াছে দেখিয়া লুব্ধ হইয়া তাহা দগ্ধ করিয়া মুড়ি দিয়া সেবা করিতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপ সেবা করিতে দেখিয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐ ভাবে দগ্ধ বেগুন ও মুড়ি সেবা করিত। ইহাতে এক এক বস্তা দগ্ধ বেগুন ও মুড়ি নিমেষেই নিঃশেষ হইয়া যাইত।

এই কথা শুনিয়া খাকিবাবা বলিতেন "দরিদ্র কাঙ্গালীরা ঐ ভাবে দগ্ধ বেগুন ও মুড়ি খায়; সেস্থলে ভদ্র ধনী অর্থাৎ অবস্থাপন্ন কাঙ্গালীরা যখন ঐ দ্রব্য রুচি করিয়া খাইতেছে, তখন তাহাদের ঐরূপ সেবায় তৃপ্ত হইতে দাও।" রন্ধন করিয়া বেগুন সেবা হইত, কিন্তু তৎপরিবর্তে ধনীজনও সে বেগুন দগ্ধ করিয়া রুচির সহিত খাইতেছে, ইহাও আনন্দের বিষয়।

ব্রাহ্মণভোজনের জন্য ব্রহ্মচারীবাবা ও খাকিবাবার সময় দেউলের চতুষ্পার্শে কোনো স্থানে রন্ধন হইত, সেবা করিতে আগন্তুক ব্যক্তিগণ অন্য কোথাও আসনে উপবিষ্ট হইতেন। দরিদ্র কাঙ্গাল যাহারা, দেউলের পথ পার্শ্বে বসিয়া তাহারা সেবা করিত।

এই পীঠস্থানে দেবী মহিষমর্দিনীর উদ্দেশ্যে এক প্রস্তরবেদী পূর্বে পূজিত হইত। মহাপুরুষ খাকিবাবা বলিয়াছিলেন, "শূন্য বেদী রাখিতে নাই।" সেই বাক্যানুসারে ধাতুনির্মিত এক দশভূজামূর্তি শিলাউপরি স্থাপিত ও পূজিত হইতেছে। ইহাতে দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, অসুর, সিংহ, সর্প প্রভৃতি মূর্তি রহিয়াছে।

সাধু-নিন্দুক এক সেবায়েত খাকিবাবাকে বিদ্রূপ করিলে তিনি নীরব ও নিরুত্তর থাকিয়া শান্তভাবে সকল বাক্যবাণ সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ধমান রাজবাটিতে দর্শন দিতে যাইলে তিনি একশত আট টাকা প্রণামী পাইতেন। উৎসবাদি বা কোন সৎকর্ম করিবার ইচ্ছা করিলে খাকিবাবার নাম উল্লেখ করিয়া তথায় পত্র দিলে যথাযোগ্য সাহায্য রাজ ভাণ্ডার হইতে চলিয়া আসিত।

এ স্থানে শ্মশানের পাটুনি (ডোমজাতি) দ্বারা নিজ বস্ত্রাদি ধৌত করাইতেন। গ্রামের বাগ্দি বা অপর কোন জাতিকে তাহা করিতে দিতেন না। লোকের সম্মান তিনি এই ভাবে রক্ষা করিতেন।

খাকিবাবা নিজ আসনে থাকা কালে সম্মুখে বালকগণ আসিয়া দাড়াইলে তাঁহার নিকটে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকিলে তাহা অথবা কিছু পয়সা হস্তে তুলিয়া দিয়া তাহাদের তুষ্ট করিতেন।

দেবী মহিষমর্দিনীর বেদী ও মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের প্রবেশস্থান তিনি ভক্তগণের সাহায্যলব্ধ অর্থে সংস্কার করাইয়াছিলেন।

শ্বেতগঙ্গার উত্তর পশ্চিম ভাগ বৃহৎ উচ্চ বেদীর চতুর্দিকে ইষ্টক দ্বারা গোলাকারে বাঁধানো ছিল। এ স্থান ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় তিনি তাহার আয়তন বৃত্তাকারে বৃদ্ধি ও উচ্চ করিয়া চতুষ্পার্শে প্রস্তর দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তি করাইয়াছিলেন। নিম্ন হইতে বেদীর উপরে উঠিবার সোপান দুইটির নিম্নে আশ্রয়স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ একান্তে ইচ্ছা করিলে তথায় বাস করিতে পারে। ঐ স্থানের পশ্চিমভাগে এক প্রাচীন কেলিকদম্ব জাতীয় বৃক্ষ ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে খাকিবাবা যখন এ তীর্থে আসেন তখন ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি ঐ বৃক্ষ পার্বত্য প্রদেশ হইতে মন্ত্র বলে চালিত করিয়া আনিয়াছিলেন। অথবা অপর কোন অপার্থিব ভাবে তাঁহার দ্বারা বৃক্ষটি আনীত হইয়াছিল। ইহার ফুল, কদম্ব ফুলের ন্যায় এবং পাতাগুলি প্রায় ঐ বৃক্ষের মতই ছিল।

ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা যে খাকিবাবার যখন দেহান্ত হয়, ঠিক সেই সময় ঐ বৃক্ষটির উত্তর ভাগ সমূলে উৎপাটিত হইয়া মাটিতে পড়ে। ইহার ফলে বেদীর প্রান্তভাগ ভগ্ন হয় এবং ভৈরবের মূর্তিটি উত্তর ভাগে হেলিয়া পড়ে।

উৎপাটিত বৃক্ষের স্থানে অধুনা একটি নিম্ববৃক্ষ আছে। সেটি বৃহৎ হইয়া উচ্চ গোলাকার বেদীর উপর শীতল ছায়া দান করিতেছে। স্থানটি বাঁধাইতে তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজা, মেদিনীপুরে নাড়াজোলের রাজা প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিগণ খাকিবাবাকে সাহায্য দান করায় উক্ত কর্ম সুসমাধা হইয়াছে। একটি ভৈরব মূর্তি ঐ স্থানে স্থাপিত আছে। অবসরসময় ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া, উচ্চ মুক্ত স্থানে বৃক্ষছায়া তলে বসিয়া খাকিবাবা সকলের সহিত বাক্যালাপ করিতেন। উহার সন্নিকটে পূর্বভাগে পানীয় জলের নিমিত্ত এক কূপ খনন করাইয়াছিলেন।

খাকিবাবা কোন বিষধর সর্প দেখিলে প্রথমে অঙ্গুলি ঘর্ষনে (তুড়ি) তিন বার শব্দ করিয়া তাহাকে স্তম্ভিত করিতেন, তৎপরে তাহার মস্তক ধরিয়া নিজ মুখ গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া তাহার বিষ টানিয়া লইতেন। এইরূপ করিয়া সর্পটি নিম্নে ফেলিয়া দিতেন। সর্প নির্জীব অবস্থায় ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিত। তিনি বলিতেন, “এইবার চলিয়া যাও”। তাহাতেই সর্প অতি ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া যাইত।

কাহাকেও সর্প দংশন করিলে খাকিবাবা মৃণালের দণ্ড ও পদ্মের পাপড়ি পিষ্ট করিয়া মাথার মধ্যভাগে এবং নাভিকুণ্ডে দিতে বলিতেন। খাকিবাবা সর্পাহত ব্যক্তির নিকট না গিয়া, নিজ আসনে থাকিয়া মন্ত্র শক্তির দ্বারা রোগীকে

বিষমুক্ত করিতেন। কখন কিরূপে কি কি ক্রিয়া করিতেন, তাহা বাহিরের লোকের ধারণার অতীত ছিল।

কোন স্থান হইতে বাহির হইবার সময় যদি কখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন কেহ খাকিবাবাকে ছত্র দান করিলে তিনি তাহা লইয়া চলিতেন বটে, কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়া যেস্থানে জলবর্ষণ ক্ষান্ত হইত সেইস্থানে কাহাকেও ঐ ছত্র দান করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেন।

কাহারও প্রদত্ত নূতন পাদুকা পদে পড়িয়া বক্রেশ্বর অভিমুখে খাকিবাবা আসিয়া দেখিলেন, বক্রেশ্বর নদীতে জল রহিয়াছে। তিনি তখন নদী তীরে পাদুকাটি রাখিয়া, পাটুনি ডোমদের ডাকিয়া বলিতেন "জুতা নদী তীরে আছে লইয়া যাও।" তাহারা ছুটিয়া গিয়া পরিত্যক্ত নূতন জুতা নিজ ব্যবহারের জন্য লইয়া যাইত। কোনো দ্রব্যে তাঁহার কোনো আসক্তি ছিল না।

খাকিবাবা যে-গুহায় বাস করিতেন তাহার উত্তর ভাগে শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণে পশ্চিমাংশ কর্দমাক্ত থাকিত। তাহাতে তীর্থআগন্তুকগণের দেবালয়ে প্রবেশ-কালে অত্যন্ত অসুবিধা হইত। সকলের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি এই স্থানটি প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়াছিলেন। গো-গাড়িতে বোঝাই করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া শকট চালক উক্ত স্থানে তাহা উপস্থিত করিত। খাকিবাবা প্রস্তর আনয়নকারীদের শ্রমমূল্যস্বরূপ পাঁচ দশ টাকা ইচ্ছামত দিতে আদেশ করিতেন। কেহ খাকিবাবাকে যদি জিজ্ঞাসা করিত "বাবা! এত অধিক পারিশ্রমিক উহার প্রাপ্য নহে।" তাহা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, "লোকটির পারিশ্রমিক, গাড়ীর বলদ ও তাহার সন্তানাদি আছে, তাহারা কিরূপে পালিত হইবে? ঐ কারণেই তাহাকে ঐ পরিমাণ টাকা দিতে বলিয়াছি।" তাঁহার চিত্তের এইরূপ উদারতা ছিল।

খাকিবাবা কোন সময়ে এক ঘোটকে আরোহণ করিয়া বক্রেশ্বর আসিয়াছিলেন। গ্রামের এক সেবায়েত ঘোটকটির সেবা ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ঘোটক মাঠে ঘাস খাইয়া চড়িয়া বেড়াইত। ছয় মাস থাকিয়া পরে এক দিন সেই ঘোটক কোথায় পলাইয়া যায়। আর তাহাকে কেহ ছুটিয়া ধরিতে পারে নাই।

বক্রেশ্বর গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্বে পাথর চাপরি গ্রাম। তথা হইতে এক সিদ্ধ মহাত্মা দাতা সাহেব, বক্রেশ্বর হইতে আধ ক্রোশ উত্তরে তাঁতিপাড়া গ্রামে আসিয়া খাকিবাবার সহিত মিলিত হইতেন। তথায় এক স্থানে বসিয়া তাঁহাদের

পরস্পর নানা প্রকার আকার ইঙ্গিতে নানা কথাবার্তা হইত। গঞ্জিকা সেবন করিয়া মিলনের পর তাঁহারা যে যাঁহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেন।

এক সময় খাকিবাবা ও ব্রহ্মচারীবাবা এ স্থান হইতে তিন ক্রোশ পূর্বে পাথর চাপরি গ্রামে "দাতা সাহেব"-এর নিকট মিলনেচ্ছায় গিয়াছিলেন। বক্রেশ্বর তীর্থের দুই বিশিষ্ট অতিথি তাঁহার নিকট যাওয়ায় 'দাতা সাহেব' তাঁহাদের জন্য দুইটি পাত্রে করিয়া চিনির পানীয় সেবা করিতে দিলেন। খাকিবাবা ঐ পাত্র লইয়া সেবা করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা পাত্র হস্তে লইবা মাত্র পাত্র কম্পিত হইতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দাতা সাহেব ব্রহ্মচারী বাবাকে বলিলেন, "যাও ! যাও !"

ব্রহ্মচারীবাবা তদুত্তরে বলিলেন, "সব কো যানে হোগা" অর্থাৎ সকলকেই যাইতে হইবে। এই কথা বলিয়া পাত্রটি নিম্নে রাখিয়া উভয়েই বিদায় লইয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন।

দাতাসাহেব ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ স্থানের মুসলমান পল্লীর সকলের প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি সেবা করিয়া গ্রাম হইতে কিছু দূরে বাস করিতেন। নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে তাঁহার কোন বাদ বিচার ছিল না।

ব্রহ্মচারীবাবা আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। অনুমান হয়, দাতা সাহেব প্রদত্ত স্পর্শদুষ্ট পানীয় সেবা করিতে অন্তরে দ্বিধাবোধ করায় তাঁহার হস্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং তিনি তাহা পান করেন নাই।

এক সময় খাকিবাবা এবং শ্মশানের অঘোরীবাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় যে কে কত গুণী তাহার পরীক্ষা হইবে। একদিন প্রাতঃকাল হইলে কর্মবীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে মন্ত্রবলে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শোনা গেল তাহা বরুণ বাণ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বিশিষ্ট সেবায়েতগণ এই কথা শুনিয়া বিপদের আশঙ্কায় দ্রুত আসিয়া উভয় মহাপুরুষকে সানুনয় নিবেদন করিয়া এই কর্ম হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। তাহাদের কাকুতি মিনতিতে শেষে উভয়ে ক্ষান্ত হইলেন।

এই তীর্থ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে জলেশ্বর শিবালয়ে চিরকুমার ব্রহ্মচারী এক ত্যাগী মহাপুরুষ বাস করিতেন। তথায় সাল নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে। তিনি তথা হইতে কয়জন ভক্ত সঙ্গে লইয়া এক সময় খাকিবাবার সহিত বক্রেশ্বরে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেই সময় খাকিবাবা নিজ গুহার সম্মুখভাগে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বালক গোস্বামী ভক্তগণসহ তথায় আসিয়া খাকিবাবার সহিত মিলিত হইলেন।

খাকিবাবার সম্মুখভাগে গাঁজার বড় কলিকা পূর্ণভাবে রাখা ছিল। তাহা

লইয়া তিনি প্রথম ধূমপান করিলেন, পরে উহা বালক গোস্বামী বাবাকে দিলেন। তিনি ঐ কলিকা লইয়া নাসিকা দ্বারা এক শ্বাসের টানে সমস্ত কলিকার গঞ্জিকা নিঃশেষ করিয়া সম্মুখভাগে তাহা উল্টাইয়া রাখিলেন। ভক্তগণকে খাকিবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি সেবা হইবে?" ভক্তগণের ইচ্ছায় বালক গোস্বামীর জন্য ঘৃত আটা এবং তাঁহার সহচরগণের নিমিত্ত চাউল দাইল প্রভৃতি প্রদত্ত হইল। তাঁহার পাচক সকলদ্রব্য ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। রন্ধনকালে অসাবধানতাবশত এক কুকুর আসিয়া ঘৃত আটায় মুখ দিল। খাকিবাবাকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি পুনরায় গোস্বামী বাবার জন্য ঘৃত আটা দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

এই তীর্থ হইতে প্রায় দুইক্রোশ পশ্চিমে রসা নামক এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের এক পরিচিত ভক্তের আহ্বানে খাকিবাবা একবার তথায় গিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের উত্তরপ্রান্তে প্রস্তর মির্মিত মন্দিরে অনাদি শিবলিঙ্গ এবং অপর মন্দিরে বামাকালী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অর্জুন রায় নামক এক ধনী ব্রাহ্মণ এই শিব মন্দির সপ্তদশ শকাব্দে নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

তথায় যে কালীমন্দির আছে তাহার উপর এক বটবৃক্ষ এরূপভাবে মন্দিরকে আচ্ছাদন করিয়াছে যে বৃক্ষ ভিন্ন মন্দিরের কোন চিহ্ন বাহির হইতে দেখা যায় না। প্রবেশের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া অতি কষ্টে মন্দির অভ্যন্তরে পূজা করিতে যাওয়া সম্ভব হয়। শাখা প্রশাখায় নামাল নামিয়া প্রায় কয়েক বিঘা ভূমির চতুষ্পার্শ ঘিরিয়া বটবৃক্ষ শীতল ছায়া দান করিতেছে।

সেই মন্দির অঙ্গনে বাহির হইতে প্রবেশ করিবার দ্বার অনাদিলিঙ্গ শিবালয়ের উত্তরভাগে ছিল। ঐ পথে খাকিবাবা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পথ পার্শ্বের উত্তরে একটি সমাধি ভূমিসংলগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। অনাদিলিঙ্গ শিবমন্দিরের উত্তরদ্বার দিয়া পূর্বমুখে দেবাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, সেই সমতলভূমিতে এক প্রোথিত শবদেহ শায়িত আছে। খাকিবাবা ঐ সমাধি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এক মহাপুরুষের এই সমাধি। লোকে দেব-দেবী দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কালে তাহাদের পদধূলি দ্বারা বা অন্য ভাবে স্থানটি অপবিত্র হয়। সেকারণ এই প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া অপরস্থানে দ্বার নির্মাণ করান ভাল।"

তাঁহার বাক্যানুসারে তথায় অপর স্থানে প্রবেশ দ্বার নির্মিত হইয়াছিল এবং পূর্বস্থান প্রাচীর গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া সমাহিত দেহের উপরিভাগ ইষ্টক দ্বারা উচ্চ করিয়া নির্মিত হয়।

খাকিবাবা বলিয়াছিলেন, "যে-মহাত্মার এই সমাধি তিনি কামাখ্যা অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনকর্ম জীবদ্দশায় সমাপ্ত না হওয়ায়, তিনি জীবন্ত অবস্থায় ঐ স্থানে আসন লইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ঝুলন পূর্ণিমার দিন তিনি সিদ্ধাসনে বসিয়া নিজ কর্ম নির্বিঘ্নে সমাধা করিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

খাকিবাবা এক সময় ডুমকা হইতে আসিবার পথে রাণীশ্বর শিবালয়ে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। তথাকার পাণ্ডাগণ তাঁহার জন্য চা পানের ব্যবস্থা করেন। ঐ স্থানে পূর্ব হইতে এক যুবক সাধু বাস করিতেন। তিনিও সকলের নিকট আসিয়া বসিলেন। খাকিবাবা বামহস্তে করিয়া সকলকে চা পাত্র দিতেছিলেন। এই-রূপ দেখিয়া যুবকসাধু বলিয়াছিলেন, "বাবা! বামহস্ত দ্বারা কি কারণে চা পরিবেশন করিলেন?"

খাকিবাবা উত্তর করিলেন, "বাম হস্তে যে কর্ম হইতেছে, দক্ষিণ হস্ত থাকিলে না জানি আরও কত কর্ম করিতাম।"

তথাকার পাণ্ডারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "খাকিবাবা ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিয়াছিল, সেইকারণে সে হস্ত তাঁহার দুর্বল।"

বক্রেশ্বর হইতে তিনক্রোশ দক্ষিণে বালীঝুড়ি গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামের উত্তরে অর্ধক্রোশ দূরে তাঁতিপাড়া গ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে এই তীর্থে আসিয়া সাধুসঙ্গ করিতেন এবং খাকিবাবার নিকট আসিয়া কখনও বসিতেন এবং বলিতেন, "বাবা! কিছু মিষ্ট খাইব, সেবা করান।"

খাকিবাবা কোনো উত্তর দিতেন না।

একদিন অতিপ্রত্যুষে খাকিবাবা বক্রেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়াছেন, অপর দিক হইতে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার তাঁতিপাড়া হইতে বক্রেশ্বর অভিমুখে আসিতেছেন। বক্রেশ্বর নদীর মধ্যভাগে উভয়ের মিলন ঘটে। মিলন হইবামাত্র মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার পূর্বের ন্যায় বলিলেন "বাবা মিষ্ট সেবা করান।"

এই কথা শুনিবামাত্র নদীর মধ্যস্থলে খাকিবাবা বলিলেন, "মিষ্ট খাইবে? এই স্থানের সম্মুখভাগে বসিয়া থাক।" এইরূপ বলিয়া উভয়ে নদীগর্ভে স্থির হইয়া বালুকা রাশির উপর বসিলেন এবং একটি ক্ষুদ্র বস্ত্র দ্বারা তিনি নিজ হস্ত আচ্ছাদন করিলেন। এইরূপ করিবার কিছুক্ষণ পরে খাকিবাবা বস্ত্রখণ্ডের নিম্ন হইতে সুজির তপ্ত সুমিষ্ট ঘৃতপক্ক মোহনভোগ উক্ত চিকিৎসকের হস্তে দিয়া বলিলেন "সেবা কর।"

সুমিষ্ট সামগ্রী সেবা করিয়া খাকিবাবার অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন।

একদিন খাকিবাবা নিজ গুহার বহির্ভাগে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক বেদে সাপ আনিয়া তাঁহাকে খেলা দেখাইতে ইচ্ছা করিল। তিনি বলিলেন "সাপের খেলা দেখাইবার প্রয়োজন হইবে না, কিছু লইয়া তুমি চলিয়া যাও।"

বেদে বার বার অনুরোধ করায় খাকিবাবা নীরব রহিলেন। ঝাপের ঢাকনি খুলিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বেদে দেখিল যে ঝাপটির ভিতর সর্প নাই। তখন বেদে মন্ত্র বলে সর্প তন্মধ্যে পুনরায় আনয়ন করে। সর্প নির্জীব অবস্থায় স্থির হইয়া কুণ্ডলী আকারে আধারে ছিল। খেলা করিবার সর্পের ইচ্ছা ছিল না। পুনঃ পুনঃ বেদের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প বেদের হস্তে দংশন করে। তৎক্ষণাৎ বেদে ধরাশায়ী হইল। নিকটবর্তী স্থান হইতে অপর রোজা ডাকাইয়া হাত বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার দেহ হইতে বিষ নামাইতে বহু চেষ্টা করিল কিন্তু ফল হইল না, ক্রমে তাহার জীবনের কোন আশা রহিল না। তখন সকলের অনুরোধে খাকিবাবা নিজ আসন হইতে উঠিয়া পাপহরা নদীর দক্ষিণাংশে চড়ক তলার দিকে গিয়া কোন এক ঔষধির পাতা হস্তে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া বলিলেন, "বেদের মাথার মধ্যভাগের কেশ ক্ষুর দ্বার কিয়দংশ চাঁচিয়া ফেলিয়া ঐ কেশমুক্ত স্থানে এই ঔষধটি লাগাইয়া দাও এবং রোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখ।

এইরূপ করিবার প্রায় একঘণ্টাকাল পরে বেদের চৈতন্য হইল এবং সে পুনর্জন্ম লাভ করে।

বক্রেশ্বর নদী পার হইয়া পূর্বভাগে প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে পলাশবন গ্রাম রহিয়াছে। বর্ষাকালে ঐ নদী পার হইয়া উক্ত গ্রামে খাকিবাবা এক সময় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে নদীর অপর ভাগে ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত খাকিবাবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

লোকটি খাকিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! নদীতে কত জল আছে?"

খাকিবাবা উত্তর দিলেন, "যেমন স্বাভাবিক জল থাকে তদ্রূপ আছে।"

লোকটি নদী তীরে আসিয়া দেখিল নদী দুকূল পূর্ণ হইয়া বহিতেছে। নদীতে এইরূপ জলরাশি বহিয়া যাইতেছে দেখিয়া সেই ব্যক্তি ছুটিয়া ফিরিয়া গিয়া পথিমধ্যে খাকিবাবার চরণ ধরিয়া বলিল, "বাবা! নদীজল দুকূল ভাসাইয়া বহিতেছে, আপনি কি করিয়া পার হইয়া আসিলেন?"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যত জল নদীতে আছে তুমি ভাবিয়াছ তত জল নাই।"

লোকে সেদিন খাকিবাবার অলৌকিক মহিমার কথা ভাবিয়া স্তব্ধ হয়। খাকিবাবা ঐশী শক্তি বলে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত পলাশবন গ্রামে এক সময় খাকিবাবা গিয়াছিলেন। ঐ দিন দ্বারিকা নাথ বাবুর বাটীতে ছাগ বলি হইয়াছে। তাহার মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া পাক করিবার উপযোগী করা হইতেছিল। খাকিবাবা তাহারই সন্নিকটে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি রক্তাক্ত কাঁচামাংস তথা হইতে লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। গৃহমধ্যে কয়জন এইরূপ দেখিয়া পরস্পর আলাপ করিতেছিল, "খাকিবাবা কাঁচা মাংসই সেবা করিতেছেন, আমাদের জন্য আর অবশিষ্ট কি থাকিবে ?"

তিনি এই কথা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে উঠিয়া বক্রেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার চরণ ধরিয়া বহু অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু দৃঢ়মতি খাকিবাবা সে গ্রামে তখন আর ফিরিলেন না।

পলাশবনগ্রামের এক সৎগোপ কৈবর্ত জাতীয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া গঞ্জিকা লইয়া প্রায়ই খাকিবাবার নিকট আসিত, কিন্তু কিছু বলিত না। এক দিন খাকিবাবা তাহাদের বলিলেন, "তোমার কঠিন কর্ম সাধন করিতে চাহিতেছ।"

তখন তাহারা নিজেদের সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, -"অমাবস্যার রাত্রিতে এ স্থানে আসিয়া শ্মশান হইতে কোন দ্রব্য লইয়া যাইবে"।

নির্দিষ্ট অমাবস্যার দিন তাহারা দুইজনে খাকিবাবার নিকট সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকট উভয়ে অত্যধিক গঞ্জিকা পান ককিয়া তাঁহার সম্মুখে নিদ্রিত হইয়া যায়। মধ্যরাত্রে তাহাদের নিদ্রাবস্থায় ডাকিয়া উঠাইয়া খাকিবাবা বলিলেন, "তোমরা যে কর্মে আসিয়াছ তাহা সমাধা করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও"।

তাহারা ঐ বাক্যানুসারে মধ্যরাত্রে শ্মশানের চিতার কয়লা লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেল।

খাকিবাবার নির্দেশ অনুসারে ঐ কয়লা খণ্ড যে-উদ্দেশ্যে লইয়া আসিয়াছিল তাহাদের গৃহের সম্মুখে ঐ শ্মশান হইতে আনীত সেই কয়লায় তিনটি চিহ্ন আঁকা হয়। তাহাতেই তাহাদের বাসনা পূর্ণ হয়।

কাটোয়ার সন্নিকটে ডাঁইহাট নিবাসী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামক এক কলিকাতার বাসনের ধনীব্যবসায়ী খাকিবাবার অনুগত ভক্ত ছিলেন। খাকিবাবা

তাঁহাকে এই তীর্থে শ্মশানবাসিনী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার নিত্য অন্নভোগের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু সজ্জন নিত্য যাহাতে পরিমিত অন্নভোগের প্রসাদ মধ্যাহ্নে সেবা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে তাহাকে আদেশ দিয়াছিলেন।

এই কথা শুনিয়া ভক্ত মুখোপাধ্যায় খাকিবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই মন্দির স্থাপন বা সেবাকার্য পরিচালনার জন্য ব্যয় কিরূপে নির্বাহ করিব, তাহার উপায় আপনি করিয়া দিবেন। একটা কোনো আয় পৃথকভাবে ব্যবস্থা না হইলে কিরূপে দেবীর সেবা স্থাপন করিব"?

এই সময়ে কলিকাতা বন্দরে এক জাহাজে পিতলের চাদর ও ঐ দ্রব্যে গঠিত সামগ্রী আসে। সেকালে পিতলের মূল্য একেবারে হ্রাস পায়। খাকি বাবা ভক্ত মুখোপাধ্যায়কে ঐ জাহাজের পিতলের দ্রব্য সমস্ত ক্রয় করিতে বলেন। তাঁহার বাক্যানুসারে পিতলের সকল বস্তু মুখোপাধ্যায় দ্বারা ক্রীত হইল। কিছুকাল পরে ঐ দ্রব্যের মূল্য অধিক হওয়ায় তাহা বিক্রয় করিয়া উক্ত হরিনারায়ণ বিশেষ লাভবান হইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে খাকিবাবা উক্ত হরিনারায়ণকে জানাইলেন, "ভাগলপুরে এক সম্পত্তি নিলাম হইবে তাহা ক্রয় করিতে যাও"। উক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাক্যানুসারে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। দেবীর সেবা পরিচালনার জন্য তিনি এই ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রসাগর পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে কেতকীফুলের বন ছিল। তাহার মধ্য ভাগে হ্যাঙ্গলা গোরে নামে এক ক্ষুদ্র জলাশয় ছিল। চন্দ্রসাগর পঙ্কোদ্ধারের কালে ঐ মৃত্তিকার দ্বারা চতুষ্পার্শ্ব ও জলগহ্বর পূর্ণ করিয়া সমভূমি করা হয়। ঐ স্থানে একটি কদম ও একটি আম গাছ ছিল। তাহা ব্যতীত কাঁটা গাছের জঙ্গল ও কেতকী কুঞ্জ-ও ছিল। এই বৃক্ষাদি বা লতাদি কাটিয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করা হয়। এই স্থানে কালীমন্দির নির্মিত হয়। মন্দির নির্মাণ কার্যে যে অর্থ প্রয়োজন হইত সমস্তই উক্ত হরিনারায়ণ খাকিবাবার নামে পাঠাইতেন। সকল অর্থ খাকিবাবার নিকট হইতে লইয়া প্রয়োজনমত ব্যয় হইত। খাকিবাবা উদাসী পুরুষ। তিনি অর্থের হিসাব বা আয়-ব্যয় কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতেন না।

শেষঅবস্থায় খাকিবাবা কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তথায় এক ভৈরবী মাতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিলেন। কালীবাড়ী নির্মাণের জন্য যে অর্থ আসিত ঐ ভৈরবী তাহা হইতে নিজ ইচ্ছামত টাকা লইয়া স্বর্ণ অলঙ্কার গড়াইয়াছিলেন। প্রাতে স্নানাদি সমাপন করিয়া

নিজ গুহার সম্মুখভাগে খাকিবাবা বসিতেন। ভৈরবী তাঁহার পার্শ্বে অলঙ্কার ভূষিত হইয়া মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া বসিয়া থাকিতেন।

ঐ ভৈরবী মাতা মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। সেই অবস্থায় কাহাকেও খাকিবাবা আদেশ করিতেন, "ভৈরবীকে উদ্দেশ করিয়া বল, তুমি এ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাও"।

এই বাক্য বলিলে ভৈরবী মাতার দেহে যে-আশ্রয় লইত সে চলিয়া যাওয়ায় তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেন।

ভৈরবী মাতাকে সঙ্গে রাখায় খাকি বাবাকে অনেকে বিদ্রূপ করিতেন। শুনা যায়, লোকের উপহাস শুনিয়া তিনি একদিন ভৈরবীমাতার বস্ত্রখানি সর্ব সমক্ষে উন্মোচন করেন। তথায় উপস্থিত জনগণ তাঁহার পুরুষচিহ্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল।

কালীমন্দিরের অর্থ এইভাবে ভৈরবীমাতা ইচ্ছামত ব্যয় করায় এবং প্রস্তরাদি আনিতে শকট চালকদিগকে যথেচ্ছমূল্য দেওয়ায়, মন্দির নির্মাণকার্য বন্ধ হইয়া যায়। পরে বর্ধমান জিলার গুসকরা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ভক্ত হরিনারায়ণের আত্মীয় এই কর্মভার চুক্তিবদ্ধ ভাবে লইয়া খাকিবাবার ইচ্ছানুযায়ী মন্দির নির্মাণ কার্য সমাপন করেন।

এই দেবালয়ে কালী দেবীর মূর্তি মধ্যভাগে, পূর্বাংশে কৃষ্ণশিলা নির্মিত শিবলিঙ্গ ও পশ্চিম ভাগে শ্বেত প্রস্তর গঠিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়।

কালীমন্দির নির্মাণ কার্য সমাধা হইলে ৩১শে আষাঢ় ১৩১৬ সাল প্রতিষ্ঠার দিন নির্দিষ্ট হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ভক্ত মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে নানা দ্রব্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বক্রেশ্বরগ্রামের সেবায়েতগণের পরিবারবর্গ মন্দিরস্থাপন দিবসে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেবায়েতগণের গৃহকর্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং সকল ব্রাহ্মণী মাতাকে নাসার জন্য স্বর্ণ নির্মিত নথ, পিতলের গামলা, কলস প্রভৃতি দিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সেবায়েতগণ ব্রাহ্মণীমাতাদিগকে নিমন্ত্রণক্ষেত্রে মন্দিরে পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

এক বাক্য শুনিয়া ভক্ত মুখোপাধ্যায় খাকিবাবাকে সেবায়েতগণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

তদুত্তরে খাকিবাবা বলিয়াছিলেন, "তাঁহারা লক্ষ্মী, গ্রাম হইতে কেন এস্থানে আসিবেন ?" এই কথা শুনিয়া ভক্ত মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

খাকিবাবা কালীবাড়ী স্থাপনের পর বলিয়াছিলেন যে, "শ্মশানকালী স্থাপন করা হইলে, এই স্থানে অন্তত একটি ছাগ বলি কালী পূজার সময় দিতে হইবে।"

সেই বাক্যে কালীমন্দির স্থাপয়িতা ভক্ত হরিনারায়ণ বলিয়াছিলেন, "বৈষ্ণব হইয়া আমি কিরূপে ছাগ বলি দিব ?"

তাঁহার কথা শুনিয়া খাকিবাবা বলিয়াছিলেন, "তবে তোমার যা ইচ্ছা হয় করিও।"

কালীমন্দির স্থাপন কার্য সমাধা হইয়া যাইবার পর ব্রাহ্মণেতর সকলেরই সেবা পূর্ণ ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। সেই আনন্দোৎসব ক্ষেত্রে অকস্মাৎ তারযোগে সংবাদ আসিল, ভক্ত হরিনারায়ণের জামাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বভাবতই এই দুঃসংবাদে সকলেই অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

ভক্ত হরিনারায়ণ বলিলেন, "আমার সন্তান সন্ততি রহিয়াছে পুনরায় যদি কোনো বিঘ্ন ঘটে, সে কারণে খাকিবাবার পূর্বাদেশ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার সম্মুখে একটি ছাগ বলির ব্যবস্থা হইবে।"

তৎবাক্যানুসারে অদ্যাপিও ঐ স্থানে দীপান্বিতা কালীপূজার দিন ছাগ বলি হয় এবং রটন্তী কালীপূজার দিন দেবীর পূজা হয়।

খাকিবাবা শেষ অবস্থায় যে-ভৈরব মাতার সঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহাকে এবং সেবক রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া এ স্থানের কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ভক্ত হরিনারায়ণের বৈদ্যনাথ ধামের বাটীতে একবার গিয়াছিলেন। তথায় অসুস্থ অবস্থায় তিনি কিছুকাল ছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার দেহান্তর হয়। তাঁহার পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী নশ্বর দেহ বৈদ্যনাথ হইতে কাষ্ঠের আধারে রক্ষিত করিয়া রেলগাড়ী যোগে দুবরাজপুর ষ্টেশনে আনীত হয়। সঙ্গে ভৈরবী, রাধানাথ, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়জন কর্মচারী ঐ শেষদেহ লইয়া আসেন। সে দেহ উপবিষ্ট অবস্থায় কাষ্ঠাধামে রক্ষা করিয়া, তুলা দ্বারা চতুষ্পার্শ পূর্ণ করিয়া সুগন্ধি তৈল সিঞ্চিত করিয়া, তৃতীয় দিনে এই ক্ষেত্রে আনীত হইয়াছিল।

তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী এই তীর্থে শ্বেত গঙ্গার উত্তর ভাগে সমাধি দিবার ব্যবস্থা হয়। সেবায়েতগণ তাঁহার শেষকৃত্য বিষয়ে সহযোগিতা করেন। তাঁহার নশ্বর দেহ কোনোরূপ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত অথবা দেহের বর্ণ মলিন হয় নাই। জীবদ্দশায় তাঁহার যেরূপ কোমল অঙ্গ ছিল শেষ অবস্থায় তদ্রূপ অবিকৃত থাকে।

সন ১৩২০ সালে ৭ই পৌষ খাকিবাবার শেষনিশ্বাস নির্গত হয়। তাঁহার সমাধিস্থানের উপরিভাগ ইষ্টক নির্মিত মন্দির আকারে গঠিত হইয়াছে।

খাকিবাবার দেহান্তের পর দুবরাজপুরের এক মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোক, যে স্থানে বাবার আসন থাকিত সেই স্থানে তিন দিন যজ্ঞ করিবার ইচ্ছায় কর্মারম্ভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ দেখিতে সে ক্ষেত্রে জনতা হইয়াছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের

কয় দিবস এক সর্প কোথা হইতে আসিয়া এক কোণাংশে কুণ্ডলী আকারে শয়ন করিয়া থাকিত। যেদিন যজ্ঞ সমাধা হইল, ঐদিন সর্পও ঐস্থান হইতে অন্তর্হিত হয়।

বক্রেশ্বর তীর্থে পুষ্করিণী সংস্কার করা, শ্বেতগঙ্গার উত্তর পশ্চিম তীরে উচ্চ বেদী বাঁধানো, কুণ্ডগুলির তীর উচ্চ করিয়া বাঁধানো, দেউলের প্রবেশপথ প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো প্রভৃতি কার্য এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে মধ্যে ভুরি ভোজনে তৃপ্ত করা খাকিবাবার বিশ্বপ্রেম ও এই তীর্থের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় বহন করে।

সে সময়ে এতদঞ্চলে বক্রেশ্বর তীর্থে 'খাকিবাবা', এ স্থান হইতে তিন ক্রোশ পূর্বে পাথর চাপড়ি গ্রামে "দাতা সাহেব", এ স্থান হইতে প্রায় একাদশ ক্রোশ উত্তর পূর্ব কোণে রায়পুর গ্রামে 'শঙ্কর' বাবা (যিনি বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন), এ স্থান হইতে প্রায় সাতক্রোশ উত্তরপশ্চিম কোণে মৌরাক্ষী নদীতীরে আমজোড়া ঘাটের অপরপারে 'ভগবান বাবা', এ স্থান হইতে আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে জলেশ্বর শিবালয়ে চিরকুমার ব্রহ্মচারী "বালক গোস্বামী" এবং এ স্থান হইতে দশক্রোশ দক্ষিণে জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রামে "কাঙ্গাল ক্ষেপা" (যাহার অদ্যাপিও অন্নসত্র আছে) পৌষসংক্রান্তির দিন এই মহাজনগণ বীরভূমের এক অংশে মিলিত হইয়া ভক্তগণের মধ্যে পবিত্র আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন।

দৈবলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবধর্ম সাধনকালে পালন করিয়া উচ্চতীর্থ উন্নত তপস্বীর তপোভূমি, গভীর ও কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ মহাযোগী জনের শান্তিময় আশ্রয়স্থল বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে মুক্তআধারে আগত হইয়া খাকিবাবা চিত্তের প্রশস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। জীবনে যাহা অর্জন করা যায়, তাপসের সেই তপোধনে সমৃদ্ধ হইয়া খাকিবাবা জীব কল্যাণ ও বিবিধ সংস্কারের দ্বারা তীর্থ উন্নতির কার্যে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

দিব্যদর্শী সদাসত্য জাগ্রত হৃদয় উন্নতমনা সর্ববরেণ্য অসাধারণ পুরুষ নির্লোভী নিরহঙ্কারী অবিকারী বিলাসমুক্ত অনাসক্ত হইয়া খাকিবাবা তাঁহার জীবদ্দশায় কিছুকালের জন্য এ তীর্থভূমি বহুজনের আকর্ষণ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ইচ্ছামাত্র সিদ্ধি এই শক্তি লাভে সেই মহামানব বহু সৎ কর্ম সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

জটালি, জটীয়া বা অঘোরী বাবা :—উৎকল দেশে বালেশ্বর জিলায় জটালি বাবার জন্মভূমি ছিল। অতি অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় তিনি খুল্লতাতের সংসারে থাকিতেন। বাল্যকাল হইতে তিনি সাধুসঙ্গ ভাল-

বাসিতেন এবং গ্রাম বা গ্রামান্তরে কোনো সাধু আসিয়াছেন জানিতে পারিলে তাঁহার সঙ্গ লাভের আশায় তথায় ছুটিয়া যাইতেন। তিনি গৃহে সকল সময় উদাসী ভাবে থাকিতেন। বাটীর আত্মীয় স্বজন কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। তিনি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেন। তিনি কেবল শয়ন ও আহারের জন্য ঘরে থাকিতেন, বাকি সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেন।

প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এক সাধুর সঙ্গ লাভ হওয়ায় তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সাধুসঙ্গে ঝাড়খণ্ড, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে সাধুসঙ্গ লাভের ও শিক্ষার আশায় কিছুকাল ঘুরিয়াছিলেন। উড়িষ্যার শেষপ্রান্তে গঞ্জামদেশে তাঁহার গুরুলাভ হইয়াছিল। তিনি গুরুর নিকট অঘোরপন্থী সাধনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্মশানে নিজ সাধনকর্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া উড়িষ্যা দেশের নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার এক পার্বত্য দেশের নিম্নভাগে গ্রামের শ্মশানে আশ্রয়স্থলে থাকাকালে সেই গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে জটালি বাবার নিকট লোক আসিত। তিনি নিজ অর্জিত সাধনা বলে তাহাদের ব্যাধি-মুক্তি বা সাংসারিক অশান্তি নিবারণে সচেষ্ট হইতেন। এইভাবে দৈবশক্তি লোকসমাজে প্রচার হইতে থাকে। নিজে স্বল্পাহারী হইলেও প্রচুর মদ্যমাংস তাঁহার আহার্য সামগ্রীর মধ্যে থাকিত।

গুরুর নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহারই সাধন করিয়া, জটালি বাবা তন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণীতে উন্নতপন্থার সন্ধান পাইয়াছিলেন। শ্মশানে বাস-কালে আপনরুচি মত তিনি আহার আসন রাখিতেন। শ্মশানের পরিত্যক্ত বাঁশ দড়ির নির্মিত-ঘরে বাস এবং মদ্য মাংস তাঁহার আহার ছিল। অপর আহারে স্পৃহা স্বল্প ছিল। যদি কেহ উত্তম ফল মিষ্টাদি লইয়া আসিত তাহার অধিকাংশই তিনি বিতরণ করিয়া দিতেন।

ময়ুরভঞ্জের পার্বত্য অঞ্চলের নিম্নভাগে এক নির্জন শ্মশানে জটালিবাবা কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তথায় থাকাকালে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের সহিত পরিচয় হয়। গ্রামস্থ লোকদের কোনো বিপদ ঘটিলে তাহারা দ্রুত আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইত।

একদিন সন্ধ্যাকালে এক নারী তাহার রুগ্ন মৃতপ্রায় পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া গ্রাম হইতে লইয়া আসিয়া শ্মশানে জটীয়াবাবার চরণতলে বসিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "আমার এই পুত্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া

মৃতবৎ হইয়াছে। আমি অসহায় নারী, নিরুপায় হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

মাতার কাতর রোদনে, দয়ালহৃদয় জটালিবাবা আসন হইতে উঠিয়া প্রথমে মৃৎপাত্র হইতে দুই তিন অঞ্জলি জল রুগ্ন বালকের দুই চক্ষে ও কপালে সজোরে ছিটাইয়া দিলেন। এই অবসরে তিনি নিজমনে মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বালকের সংজ্ঞা লাভ হইল। রাত্রিতে মাতা পুত্র ক্রোড়ে লইয়া শ্মশানেই কাটাইল। পরদিন প্রাতে মাতা জীবিত পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া শ্মশান হইতে গ্রামে ফিরিয়া গেল। সেই হইতে ঐ অঞ্চলে জটীয়াবাবার সুনাম অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

কাহারও গৃহে পৈশাচিক প্রেতাত্মার উপদ্রব, পুষ্করাদোষ প্রভৃতি ঘটিবার সংবাদ পাইলে, জটালি বাবা কখনো সেই উৎপীড়িত স্থানে গিয়া, কখনো নিজ আসনে বসিয়া এই সকল উপদ্রব দূর করিতেন। যেকোন সংসারী লোক অশান্তি পাইলে, তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। তিনি সকল কথা স্থির হইয়া শুনিতেন এবং সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। জটালি বাবা কোন কিছুর প্রত্যাশী হইয়া লোকের উপকার করিতেন না কিংবা কোন প্রতিদানের আশা করিয়া কোন কর্মে ব্রতী হইতেন না। বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, মনুষ্যকে শান্তিদান করিবার ইচ্ছাই তিনি শুধুমাত্র মনে মনে পোষণ করিতেন।

গভীর রাত্রিতে জটালি বাবা আপন মনে কি বলিতেন, দূর হইতে সেই শব্দ শুনিলে মনে হইত তিনি যেন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। দিবাভাগে একক থাকিলে নিজমনে কখন কখন তিনি কথা বলিয়া যাইতেন। আকস্মিক কেহ নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অল্প বাক্যে তাহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। তিনি সকলকে সমজ্ঞান করিয়া সদালাপে সকলকেই তৃপ্ত করিতেন। সকলেরই সকল কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। কাহাকেও উপেক্ষা করিতেন না। তবে কাহাকেও আচারনিষ্ট ব্যক্তি বুঝিলে তিনি সতর্কতার সহিত তাহাকে কিছু সেবা করিতে বলিতেন অথবা জানাইতেন, "তোমার যখন এস্থানে সেবা করা হইবে না তখন তুমি এ স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পার"—এরূপ বলিয়া সেবার সময় তিনি তাহাকে বিদায় দিয়া দিতেন। কোন সময়ে জটালিবাবাকে একজন প্রশ্ন করিল "মনে শান্তি কিরূপে লাভ হয়?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "অনন্য স্মরণে এবং ব্যাকুল প্রাণে কাতর আহ্বানে দেবতার কৃপালাভ করা যায়। তখনই মনে আনন্দ ও শান্তি আইসে।"

ঐশ্বরিক শক্তিলাভে সিদ্ধ মহাপুরুষ হইলেও তিনি অতি সাধারণ মনুষ্যের

ন্যায় দীনভাবে থাকিতেন। নিতান্ত প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি সিদ্ধসাধন শক্তি প্রকাশ করিতেন। নিজে গুণবান হইয়াও সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁহার পরিচয় দিতেন না। তিনি নারীর সংশ্রব কখনই পছন্দ করিতেন না।

কেহ সংসারে বিষয়-জ্বালায় পীড়িত হইয়া জটালি বাবার নিকট আসিলে, তিনি বলিতেন, "যত বিছে (বৃশ্চিক), তত কামড় (দংশন)। অর্থাৎ যত বিষয় ব্যাপারে জড়িত হইবে ততই বিষয় বিষের জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। এই তীব্র বেদনা বিষয়শক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল।"

তিনি বলিতেন, "সংসারে কর্তব্য পালন করিয়া ভগবৎ ভক্তি ও জীবে সমভাবে পালন করা, ধর্ম নতুবা উর্ধ্বে পদ রাখিয়া সংসারে অস্বাভাবিক ভাবে চলিবার চেষ্টা করা বৃথামাত্র"।

"ধর্ম বুদ্ধি থাকিলে জীবনের গতি সরল হয়"।

"ঈর্ষা, দ্বেষ, বিরুদ্ধ-ভাব পোষণ করিয়া সংসারে পরস্পর অশান্তির সৃষ্টি করিলে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এইরূপ মনোভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতা দ্বারা জীব শান্তিলাভ করে।"

"সর্বদা প্রেমেরভাব আত্মজনের মধ্যে রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিও" এইরূপ বাক্যে সকলকে জটালিবাবা সৎজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিতেন।

সংক্ষিপ্ত উপদেশ অঘোরীবাবা ভক্তগণকে সময়ে সময়ে দিতেন।

জটিয়াবাবা বিবিধস্থানে শ্মশানে বাস করিয়াছিলেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর তিনি কাটোয়া শ্মাশানে ছিলেন। তিনি তথাকার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "শ্মশানের ফুলি পাটুনি পাক করে ভাল।"

সে সময় কাটোয়া শ্মশানের ঘাট ফুলি নাম্নী এক পাটুনী সরকারের নিকট হইতে নিলামে ডাকিয়া লয়। লোক রাখিয়া তথাকার শ্মশানের সকল কর্ম সে করাইত। সেই ফুলি পাটুনি জটিয়াবাবার মদ গাঁজা খাদ্যাদি সকল সংগ্রহ করিয়া দিত এবং যত্ন সহকারে রন্ধন করিয়া সেবা করাইত।

কাটোয়া হইতে অঘোরীবাবা এস্থানে আসিয়াছিলেন। প্রথমে বক্রেশ্বর শ্মশানে আসিয়া পাটুনীদের (শব সৎকারকারক) দ্বারা তথাকার বাঁশ মৃতাচ্ছাদন তালাই প্রভৃতি শ্মশান পরিত্যক্ত দ্রব্য দ্বারা জটালিবাবা এক কুটীর নির্মাণ করান। শ্মশানের পূর্বভাগে লোকে সেসময় শবসমাধি করিয়া যাইত। জটালিবাবা বহু চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমে ঐ স্থান মৃত্তিকা দ্বারা সমভূমি করাইয়া বাসোপ-যোগী করিয়া তোলেন। পাটুনীরা, কোড্ডের সঞ্জয় সাহা এবং অপর ভক্তগণ

তাঁহার কুটীর নির্মাণ কার্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। উক্ত সাহা নিজ দোকান হইতে প্রায় নিত্যই কারণ-বারি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিত।

প্রথম অবস্থায় জটালি বাবা এই স্থান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে ছোলা-বেড়ে গ্রাম, যেস্থানে সৎগোপগণের অধিক বাস তথায় মধ্যে মধ্যে যাইতেন। সেই গ্রামের বাইরে বৃক্ষতলে জটালিবাবা আশ্রয় লইতেন। উক্ত গ্রামে কিছু দিন থাকিয়া পুনরায় বক্রেশ্বরে ফিরিয়া আসিতেন।

এস্থান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ উত্তর কোণাংশে হোরপুর গ্রামের নিকট সাজনে কয় গ্রামের পার্শ্বে শাখা নদী তীরে গিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি নির্জনে বাস করিতেন। অল্প বৎসর বাহিরে ঘুরিয়া আসার পরে আর এ স্থান তিনি ত্যাগ করিয়া যান নাই।

এ স্থানের শ্মশান ভূমির পূর্ব ভাগ সমতল করাইয়া জটিয়া বাবা তথায় নানারূপ ফল ফুলের ও শাক সব্জি গাছ লাগাইয়া এক মনোরম ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া-ছিলেন। তথায় প্রচুর দ্রব্য জন্মাইত। যে সকল বালক বা অপর কেহ তাঁহার নিকট যাইত তিনি তাহাদের ঐ সব সামগ্রী দান করিতেন।

জটিয়াবাবা খর্বাকৃতি ছিলেন। দেহ তাম্রবর্ণ ছিল, গুম্ফ শ্মশ্রু অল্প ছিল চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল ভাবে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার শিরে একখানি কুলার মত জমানো বৃহৎ চুলের গুচ্ছ জটা বাঁধা থাকিত।

প্রথমাবস্থায় বক্রেশ্বরে আসিয়া অঘোরীবাবা সৎকারার্থে শ্মশানে শব আসিলে শ্মশানবন্ধুদের তথাকার যথা কর্তব্য পালন করা হইলে তাহাদের তথা হইতে দূরে চলিয়া যাইতে বলিয়া, নিজে ঐ শব দাহ করিতেন।

অঘোরীবাবা পাটুনীদের বলিতেন, "অমাবস্যার দিন শবদাহের জলন্ত অবস্থায় চিতামধ্যস্থিত ভস্ম এবং কড়ি লইয়া আসিয়া আমাকে দিবে।"

পাটুনীরা তাঁহার বাক্যানুযায়ী কর্ম সাধন করিত।

শ্মশানে যখন লোক শবদাহ করিতে আসিত সেই সময় পাটুনীদের ডাকিয়া জটিয়া বাবা বলিতেন, "ঐ চিতা শয্যার নিম্নে একটি পাত্র রাখিয়া দিও। দগ্ধ শবের মেদ গলিত হইয়া উহাতে সঞ্চিত হইবে।"

ঐ গলিত মেদ তিনি কোন আধারে স্থাপন করিয়া রাখিতেন। রন্ধনের সময় পাক কার্যে তিনি ঐ পদার্থ ব্যবহার করিতেন।

কোনো শিশু শ্মশানে সমাধিস্থ হইলে, তিনি ঐ সংবাদ পাইলে পর পাটুনীদের বলিয়া উহাকে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া, জলে পরিষ্কার ভাবে ধৌত করিয়া, পূর্ণিমা নাম্নী পাটুনীকে তাহা পাক করিতে বলিতেন। ঐ মৃত শিশুর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া বাবার রুচি মত সে রন্ধন করিয়া দিত।

বক্রেশ্বর শ্মশানের পূর্ণিমা পাটুনী অঘোরীবাবার নির্দেশমত পীড়িতা স্ত্রী-লোকদিগকে বাধক প্রদর প্রভৃতি ব্যাধির ঔষধ দিত।

নিজ ব্যবহারের জন্য ভাল তামাক, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি একত্র সংমিশ্রিত করিয়া জটালিবাবা এক মাস সেবার উপযুক্ত পরিমাণ মাদক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিতেন। এই তামাক তিনি নিজে সেবন করিতেন। এই কলিকার তামাক তিনি অপর কাহাকেও সেবা করিতে দিতেন না।

বক্রেশ্বর নদীর দক্ষিণভাগে যেস্থানে পূর্বে শিশুগণের সমাধি দেওয়া হইত, তাহার উপরিভাগে কয়েকটি খেজুর সাওরা গাছ বেষ্টিত স্থানে কালীমাতার স্থান আছে। এই কালীমাতার পূজা পূর্বে কর্মকারগণ করিত। নদীতীরে ঐ নির্জন শ্মশানে রাত্রিযাপন করিতে মধ্যে মধ্যে জটিয়াবাবা তথায় যাইতেন।

অঘোরীবাবা নিজ আসনে থাকাকালে কাহাকেও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতেন না। সেজন্য বাঁশের বেষ্টনীর মধ্যে কখনো কখনো আবৃত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

জটালিবাবা অঘোরপন্থী ছিলেন, সেই কারণে কাহারও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেন না। গৃহের বাহিরে বা অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন বা গৃহের বাহিরে কোন স্থানে নিজের আসন রক্ষা করিতেন।

জটিয়াবাবা কখনো কখনো পাপহরা নদী জলে ডুবিয়া স্নানকালে জল মধ্যে মগ্নাবস্থায় বহুক্ষণ কুম্ভক করিয়া থাকিতেন। জলের উপরিভাগে সর্পের ফণার ন্যায় তাঁহার মস্তকের বৃহৎ জটা ভাসিত।

এক সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঝাপর তলার এক কৈবর্ত চাষী জটালিবাবার নিকট আসিলে, মাথার উপর যে এক খণ্ড মাংস চালে বাঁধা অবস্থায় ঝুলিতেছিল, তাহা নামাইয়া অঘোরীবাবা তাঁহার জন্য সেইটিকে পাক করিতে বলিলেন। কিন্তু চাষী প্রথমে তাহাতে সম্মত হইল না, কিন্তু পরে বাবার বিশেষ অনুরোধে সে পাক করিতে আরম্ভ করে। কিছুকাল পরে তাহার গন্ধে এবং যখন শুনিল উহা শূকর মাংস তখন সে কৃষক সমস্ত ফেলিয়া পলাইয়া যায়। জটালিবাবা এইরূপ আচরণে কৃষকের প্রতি চিমটা লইয়া ধাবিত হইয়াছিলেন।

বর্ষাকালে জটিয়াবাবা বক্রেশ্বর নদীর উপর দিয়া খড়ম পড়িয়া অপর পারে চলিয়া যাইতেন। সে সময় জটিয়াবাবার পদদ্বয় জলস্পর্শ করিত না। নদী তীরবর্তী লোকে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেখিত।

জটালিবাবার আশ্রমের দক্ষিণ ভাগে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে। ঐ তরু-

মূলে তিনি তাঁহার জটা এবং কিছু মুদ্রা রক্ষিত করিয়া তদুপরি গোলাকার এক বেদী নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

শবদেহের যেস্থানের মাংস অঘোরীবাবার সেবা করিবার ইচ্ছা হইত তিনি চিতাদগ্ধ শবের এক খণ্ড মাংস পাটুনীদের লইয়া আসিতে বলিতেন। তিনি অর্ধদগ্ধ নরমাংস একান্তে বসিয়া মদ্যসহ আহার করিতেন।

শবদাহের সময়ে শ্মশানের উত্তর পার্শ্ব দিয়া দুর্গন্ধ আসিতে থাকিলে তাহা নিবারণের জন্য নাসিকায় কাপড় দিয়া কেহ কেহ জটালী বাবার আশ্রম অভিমুখে ধাবিত হইত। জটিয়াবাবা কাহাকেও এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট আসিতে দেখিলে এক চিমটা হস্তে লইয়া নিজ আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেন, "যদি শবদাহের দুর্গন্ধ তোমার সহ্য না হয় তবে শ্মশানে স্থিত আমার এই আশ্রমে আসিবার কি প্রয়োজন? যাও তুমি ফিরিয়া যাও।" এই বলিয়া তাহাকে মধ্যপথ হইতে ফিরাইয়া দিতেন।

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি জটালি বাবাকে নিজ রোগ সম্বন্ধে কিছু জানাইত, তাহা হইলে তিনি তাহার পৃষ্ঠে নিজ হস্ত দ্বারা দুই এক বার থাবড়া দিয়া বলিতেন, "যাও তোমার রোগ ভাল হইয়া যাইবে।" এই বাক্যেই রোগী রোগমুক্ত হইত।

আবার কখন কোন অসুস্থ লোক নিজ রোগের কথা জানাইলে জটালিবাবা নিজ ব্যবহৃত নরমুণ্ডের খপ্পর তাহার হস্তে দিয়া বলিতেন, "এই খপ্পর লইয়া সম্মুখের ঐ পাপহরার নদীর জল অল্প পরিমাণে পান কর।" তাঁহার কথামত রোগী তদ্রূপ করিলে, তদ্দ্বারা সুফল পাইত।

জ্বর আরোগ্য না হওয়াতে যে-ব্যক্তি জটালি বাবার নিকট আসিয়া বলিত, "বাবা! আমার জ্বর ছাড়িতেছে না, কি করিব?" তাহা হইলে অঘোরীবাবা তাহাকে বলিতেন, "ভিজে অন্ন ও তেঁতুলের অম্ল সেবা করিও।" তাঁহার সেই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এবং নির্দেশ অনুযায়ী সেবা করিলে রোগী সুস্থ হইত।

বক্রেশ্বর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে রাজগঞ্জ গ্রামে এক ধীবর কৈবর্তের বাস ছিল। তাহার গৃহে এক ব্রহ্মচারী গোঁসাই-র পূজা হইত। জটালিবাবা ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে গিয়া মদ্যমাংসাদিসহ নিজ কর্ম করিতেন এবং সেবান্তে বক্রেশ্বরে নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন।

এক সময় বক্রেশ্বর গ্রামের কয়জন ব্রাহ্মণ অঘোরীবাবার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জটালিবাবা! আমাদের ভাল মদ দিতে হইবে।"

তদুত্তরে জটিয়া বাবা তাহাদের বলিলেন, "মদ কোথায় পাইব বাবারা?"

ব্রাহ্মণগণ তাঁহার কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মদিরার কোন সন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া পুনরায় আঘোরীবাবাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, "আপনাকে ভাল মদ দিতেই হইবে।"

তদুত্তরে জটালিবাবা বলিলেন, "ঘরে গিয়া ভাল করিয়া দেখিলে মদ নিশ্চয়ই পাইবে।"

তিন চারিজন ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে পুনরায় এই বাক্যানুসারে প্রবেশ করিয়া অতি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, ছোট একটি টিনের পাত্রে মদ্য পূর্ণ রহিয়াছে। সকলে প্রার্থিত উত্তম শ্রেণীর মদ্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ চিত্তে তাহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

বক্রেশ্বর গ্রামের এক মোদকের ভ্রাতা দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মোদক আঘোরীবাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইল।

জটালিবাবা তাহাকে বলিলেন, "উপস্থিত তুমি যাও, একদিন আমি তোমার বাটী যাইয়া রোগীকে দেখিয়া আসিব।"

সুযোগমত একদিন অঘোরীবাবা মোদকের বাটী যাইয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া রোগীকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। তথায় রোগীর দুই চক্ষু দেখিয়া মোদককে বলিলেন, "একটি শিশিতে উত্তম মধু লইয়া কেহ আমার নিকট যাইও।"

মোদক পরদিন মধু লইয়া অঘোরীবাবার নিকট উপস্থিত হইল।

জটালিবাবা ঐ শিশির মধুতে কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলেন। ঐ মধু মিশ্রিত ঔষধ অন্ধব্যক্তির চক্ষুতে লেপন করিয়া দেওয়ায় অত্যাশ্চর্য ভাবে, অল্প কালের মধ্যেই তাহার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে।

পণ্ডিতপুরের মাহতো পরিবারের এক ধনী ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার বিষয়সম্পদ প্রচুর ছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল। সন্তান না হওয়ায় দরুন মনস্তাপে ঐ ধনীটি অবশেষে অঘোরীবাবার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে জটালিবাবার কৃপায় উক্ত মাহতো পর পর এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। সে কারণে ধনী লোকটি জটীয়াবাবার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। অঘোরীবাবার দ্বারা যদি কোন কর্ম শ্মশানের আশ্রমে সাধিত হইত, ঐ ধনী মাহতো সে স্থানে সেবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইতেন এবং নিজেও উৎসবক্ষেত্রে কখন কখন উপস্থিত হইতেন। এযাবৎ ধনীর বংশধর জটিয়াবাবার সমাধিস্থানে শিবরাত্রির সময় যে-উৎসব হয় তাহাতে সাহায্য করেন।

এক সময় জটালিবাবা ও এই গ্রামের সেবায়েত রঞ্জন আচার্য বক্রেশ্বর হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে রামপুর গ্রাম হইতে একত্র আসিতেছিলেন। সেই সময় জল-বর্ষণ আরম্ভ হইল। রঞ্জন আচার্য জটালিবাবাকে বলিলেন, "বাবা! বৃষ্টি হইতেছে। কি করিবেন?"

অঘোরীবাবা উত্তর দিলেন, "তোমার নিকট ছাতা রহিয়াছে, তুমি উহা দ্বারা জল নিবারণ কর।"

বাবার হস্তে একটি চিম্‌টা ছিল, তিনি ঐটি লইয়া মস্তকের উপর ঘুরাইয়া তিনবার গুরুনাম উচ্চারণ করিলেন। জলবর্ষণ হইতে থাকিলেও তথা হইতে দেড় ক্রোশ পথ দুইজন না ভিজিয়াই চলিয়া আসিলেন। জটালিবাবা নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! আপনার শরীর-বস্ত্র কিছুই তো জলবর্ষণে সিক্ত হয় নাই?" ভক্ত সঙ্গী এইরূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর হইতে প্রায় ছয়ক্রোশ পশ্চিমে বাগডোরি নামক এক গ্রাম রহিয়াছে। এক বৎসর তথায় অনাবৃষ্টি হওয়ায় শস্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। সেই গ্রামের কয়জন আসিয়া জটালিবাবার নিকট গ্রামের দুরবস্থার কথা নিবেদন করিল। তিনি গ্রামবাসীদের নিকট সকল কথা শুনিয়া তাহাদের একটি নির্দিষ্ট দিন স্থির করিয়া দিলেন এবং ক্রিয়ার নিমিত্ত যে সকল বস্তু সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহাও তাহাদের লিখিয়া দিলেন। পূর্ব হইতে যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণব্রতী তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

যথাসময়ে জটালিবাবা উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজ কর্ম করি-লেন। কৃতী ব্রাহ্মণগণ যথোচিত নিয়মে যজ্ঞ সমাধা করিয়া পূর্ণাহুতি দিবার পূর্বে অঘোরীবাবা গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া যাও নতুবা অতি বর্ষণে কেহ ঘরে ফিরিতে পারিবে না।"

তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিল, "আকাশ নির্মল দেখিতেছি. কোথাও মেঘের কোন চিহ্নই নাই, তবে এত শীঘ্র কিরূপে বৃষ্টি হইবে?"

যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত ভাবে দাঁড়াইয়া তিনি পূর্ণাহুতি দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং তৎসঙ্গে ঘোর বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল।

বক্রেশ্বর হইতে প্রায় দুইক্রোশ দূরে উত্তরপশ্চিমে একগ্রামে বিসূচিকা রোগ আরম্ভ হয়। রোগের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় প্রত্যহই বহু লোক তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। গ্রামবাসী কয়জন তথা হইতে আসিয়া অঘোরীবাবার

শরণাপন্ন হইল। ঐ গ্রামে যাইয়া যথা কর্তব্য পালন করিয়া গ্রামবাসীকে তিনি রোগমুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে গ্রামবাসীরা জটিয়াবাবাকে কি দিবে জিজ্ঞাসা করায় জটিয়াবাবা তাহাদের বলিয়াছিলেন, "বক্রেশ্বরে তাঁহার আশ্রমে প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রাত্রিতে শুধু "গুরুবোল" এই নাম উচ্চারণ করিতে হইবে।"

সেই গ্রামবাসীরা এবং ক্রমে ক্রমে অপরস্থানের ভক্তেরা মিলিত হইয়া তাঁহার আশ্রমে উক্ত নাম নির্দিষ্ট তিথিতে রাত্রিতে কীর্তন করিত। ভক্তেরা তাঁহার আশ্রমে "গুরুবোল" নাম শেষ করিয়া বক্রেশ্বর দেবমন্দিরের চতুষ্পার্শে ঘুরিয়া পুনরায় ঐ আশ্রমে নাম করিতে করিতে ফিরিয়া যাইত। রাত্রিতে আশ্রমে আগত সকল গায়কেরই সেবার ব্যবস্থা হইত। সকলের সম্মিলিত নাম ধ্বনিতে ঐ স্থান মুখরিত হইয়া উঠত। নাম শেষ হইলে "বোল বোল" এই অনাহতধ্বনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত।

রাত্রিতে এই নাম ধ্বনি যখন হইত তখন আশ্রমে বাঁশের খণ্ডের মধ্যভাগ কয়েকস্থানে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে কেরোসিন তৈল ভরিয়া পলিতার সাহায্যে মশালের মতো আলো সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জ্বলিত।

সিউড়ির সঞ্জয় সাহা, করিধ্যার ভক্ত বণিক, গোয়ালিয়ারার কাঙ্গাল দত্ত সময়ে সময়ে বা বিশেষ কর্ম উপলক্ষে জটালিবাবার আশ্রমে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাকের কার্যে সহায়তা করিতেন।

একদা বক্রেশ্বর গ্রাম হইতে আধক্রোশ পূর্বে পলাশবন গ্রাম হইতে কয়েকজন জটিয়াবাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের "গুরুবোল" নাম করিতে বলিলেন। ভক্তগণ প্রায় তিনঘণ্টাকাল উচ্চৈঃস্বরে ঐ নামকীর্তন করিল।

কীর্তন শেষ হইলে অঘোরীবাবা তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কিছু সেবা কর।" তন্মধ্যে একজন বলিল, "আমরা কিছু সেবা করিব না।" তাহার মনোভাব সাধুর আশ্রমে কেন বৃথা সেবা করিব, নিকটেই তো গৃহ, তথায় ফিরিয়া গিয়া আহারাদি করিলেই হইবে।

তন্মধ্যে এক বয়স্ক কৈবর্ত মনে মনে চিঁড়া দধি সেবা করিবার ইচ্ছা করে। জটালিবাবা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চিঁড়া দই সেবা করিবে?"

সেই ভক্ত সম্মতি প্রকাশ করিল। তখন তাহাকে জটালিবাবা বলিলেন, "কুটীর মধ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া আইস।"

একজন আশ্রম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ঝুড়ির মধ্যে চিঁড়া পাইল কিন্তু কোন পাত্রে দধি পাইল না। লোকটি বাহিরে আসিয়া ঐকথা প্রকাশ করিয়া বলিল, "ঘরের মধ্যে যে কয়টি মৃৎপাত্র আছে তন্মধ্যে সন্ধান করিয়া দধিমিষ্ট পাইলাম না।"

ভক্তটিকে পুনরায় কুটিরের মধ্যে তিনি দেখিতে বলিলেন। লোকটি তাঁহার আদেশ পাইয়া মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে ভালো করিয়া সন্ধান করিতে করিতে একটি পাত্রে দধি ও অপর একটি পাত্রে মিষ্টান্ন পাইয়া উহা লইয়া বাহিরে আসিল এবং সকলে চমকিত হইয়া একত্রে বসিয়া তৃপ্তির সহিত উহা সেবা করিল।

কখনো কখনো জটালিবাবা নিজ আশ্রমে অন্নযজ্ঞ করাইতেন। সেই সময় ঐ ক্ষেত্রে ডোম, বাগ্দি, মাল, মুচি প্রভৃতি জাতির অধিক সমাগম হইত।

একবার শ্মশানে শবদাহ করিতে কয়েকজন লোক আসিয়াছিল। জটালিবাবা এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "শ্মশানে উহাদের নিকট হইতে একখণ্ড কাষ্ঠ যাচ্ঞা করিয়া লইয়া আইস।"

তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া লোকটি শ্মশানে শবদাহকারীদের নিকট জটিয়া বাবার জন্য কাষ্ঠপ্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহারা কাষ্ঠ দিতে অস্বীকৃত হয়। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া জটিয়াবাবাকে এই কথা জানাইলে তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তাঁহারা যখন কাষ্ঠ দিতে অনিচ্ছুক তখন তাহাতে ক্ষতি নাই।"

সেই লোকগুলির বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শবদাহ আর হইতেছিল না। বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোনরূপে শ্মশানে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিয়া শেষে তাহারা নিষ্কৃতি পাইল। মনে মনে তাহারা বেশ বুঝিল যে এরূপ দুর্ভোগ জটালিবাবাকে কাষ্ঠ খণ্ড না দেওয়াতেই ঘটিয়াছে।

সেই গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরিয়া যাইবার কিছুদিন পরে তথায় বিসূচিকা রোগ আরম্ভ হওয়ায় বহু লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ ঘটনায় বিপন্ন হইয়া গ্রামের কয়জন জটালিবাবার নিকট আসিয়া সকল ঘটনা প্রকাশ করিল। এক স্থিরীকৃত দিনে জটালিবাবা ছোলাবেড়ে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য এক কুটীর নির্মিত হইল। তিনি তথায় সকলকে নাম সংকীর্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। অহোরাত্র নাম ধ্বনিতে আকাশ ভরিয়া উঠিল। তিনদিনের মধ্যে গ্রামবাসীদের রোগের চিন্তা মুক্ত হইল। জটালিবাবাও তথা হইতে নিজস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সকলে বলিল, "বাবাকে শ্মশানের কাষ্ঠখণ্ড দিতে আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম তাহারই ফলে সারা গ্রাম এই কঠিন ব্যাধি ভোগ করিল।"

এস্থান হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ পূর্বে শ্রীরামপুর গ্রামে এক ভূমিখণ্ড দেবাশ্রিত হওয়ায় তাহা দীর্ঘকাল পতিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তথাকার এক বাগ্দি উহার ভূস্বামী। অঘোরীবাবাকে আসিয়া সে সকল কথা নিবেদন করিল। প্রেমলাল নামে এক সেবক জটালিবাবার আশ্রিত ছিল। জটালিবাবা অগ্রে তাহাকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিয়া আবশ্যকীয় বস্তুর সহিত মদ্য মাংস সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বলিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি উপরিউক্ত স্থানে গিয়া সে স্থানের উপযোগী কর্ম সমাধা করিয়া লাঙ্গলের দ্বারা ঐ ভূমিখণ্ডের সম্মুখভাগে তিনি কিছুক্ষণ হলকর্ষণ করাইলেন। অধুনা ঐ স্থানে নিরাপদে চাষ হইতেছে।

একসময়ে দুবরাজপুর অঞ্চল হইতে দুই বন্ধ্যা নারী জটালিবাবার শরণাগত হয়। উহাদের সানুনয় অনুরোধে তিনি বলিলেন, "তোমাদের সন্তানলাভের সম্ভাবনা নাই, আমি কি করিব? ইহা গাছের ফল নয় যে একটি খাইতে দিলেই সন্তান লাভ হইবে।"

এইবাক্য শুনিয়া নারী দুইটি তাঁহাকে বিশেষ কাকুতিমিনতি করিতে বলিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে সকলি সম্ভব হয়।"

তাহাদের নিকট জটালিবাবার অপর ভক্তগণ বসিয়াছিল। তাহারা নারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমাদের যেরূপ সামর্থ বাবাকে ক্রিয়া করিবার জন্য অর্থ ধরিয়া দিয়া যাও। তিনি যথাবিহিত করিবেন।"

এক নারীর কাপড়ের এক কোণাংশে পনের টাকা বাঁধা ছিল। তাহা লইয়া জটালিবাবার চরণ সমীপে রাখিয়া প্রণাম করিল।

সেইদিন রাত্রিতে নারী দুইটি এই গ্রামেই আশ্রয় লইল। যে-নারী টাকা দিয়াছিল, সে সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় কেবল ভাবিতেছিল, "টাকা সাধুবাবাকে দিলাম, যদি সন্তান লাভ না হয় তবে আমার টাকা বৃথাই নষ্ট হইল।"

পরদিন প্রত্যুষে নারী দুইটি জটালিবাবার নিকট আশ্রমে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল।

জটালিবাবা তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ঐ দেখ, তোমাদের টাকা যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছ, ঐ স্থানেই পড়িয়া আছে। তোমরা টাকা ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

নারীদুটি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিল, "রাত্রিতে আমাদের মনে টাকার জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল সাধুবাবা নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।" এইরূপ অবস্থায় তাহারা কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় উপস্থিত ভক্তগণ নারীদের বলিল, "তোমরা সাধুবাবাকে একবার যাহা দান করিয়াছ তাহা পুনরায় ফিরাইয়া লইও না।" সেই কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া শূন্য হৃদয়ে নারীরা নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

জটালিবাবার নিকট কয়েকটি ভীষণ প্রকৃতির কুকুর থাকিত। তাহারা শ্মশানের নরমাংস খাইয়া অতি ভীষণ হিংস্র স্বভাবের হইয়াছিল। শ্মশানে মাংস খণ্ড লইয়া যখন তাহারা পরস্পর খাদ্য লোভে কলহ করিত, তখন অঘোরীবাবা নিজ আসন হইতে উঠিয়া কুকুরগুলির মধ্যে মাংসখণ্ডগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বণ্টন করিয়া তাহাদের শান্তভাবে খাইবার সুযোগ করিয়া দিতেন। জটালিবাবা এই কুকুরগুলিকে যেদিকে হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ দিতেন, তাহারা সেইদিকের গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইত। পূর্বে পলাশবন, রাজগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে গিয়া ছাগ-মেষ-গোবৎস সকলকে আক্রমণ করিয়া বধ করিত পরে তাহাদের মাংস সেবা করিত। পশ্চিমে রামপুর গ্রামে এক দুগ্ধবতী গাভীকে কুকুরগুলি বধ করিয়াছিল।

একদিন বৈকালে অঘোরীবাবা একটি বোতলে করিয়া ঐ গ্রামের এক দোকানে কেরোসিন তৈল ক্রয় করিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকটি তৈল আনিয়া তাঁহাকে দিলে তিনি বলিলেন, "তৈল অল্প দিয়া বিক্রেতা তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে।" সেই কারণে তিনি নিজে ঐ বিক্রেতার নিকট গিয়া বলিলেন, "গ্রাহকের নিকট উচিত মূল্য লইয়া তুমি তাহাকে প্রতারণা কেন করিলে?" এই কথা বলিয়া সেই দোকানের প্রাচীর গাত্রে নিজ মস্তক সজোরে আঘাত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর দোকানী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বক্রেশ্বরগ্রামের উত্তরপশ্চিমাংশে বক্রেশ্বরনদীতীরে এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া এক অশরীরী ব্রহ্মচারী বাস করেন লোকমধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। একবার জটালিবাবার ধুনির কাষ্ঠের অভাব হয়। স্থানীয় সেবায়েতগণকে তিনি ঐ বৃক্ষটি কাটিয়া নিজ প্রয়োজনে লাগাইবেন এই যাচ্ঞা করেন।

সেবায়েতগণ বলেন, "আমরা বৃক্ষটি লইতে অনুমতি দিব না বা অসম্মতিও জানাইব না। আপনি যদিচ্ছা করিতে পারেন।"

তখন জটালিবাবা স্বেচ্ছায় ঐ বৃক্ষ কাটিতে আদেশ করেন। কুঠারিয়া তাহাতে সম্মত হয় না। জটালিবাবা প্রথম কুঠার দ্বারা ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষে আঘাত করিবার পর কাঠুরিয়াগণ বৃক্ষটি কাটিয়া তাহা ভূমিসাৎ করিল। যে সময় ঐ বৃহৎ তরুবর পতিত হয়, সে সময় এক বিকট ধ্বনিতে চতুর্দিক নাদিত হয়। এই ঘটনার পরই জটালিবাবা অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন।

শেষাবস্থায় জটালিবাবা কুব্জ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায়

ভক্তগণ তাঁহাকে পরিচর্যা করিতে আসিত। পীড়িত অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারিতেন না। তিনি ভক্তদের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আসিতে বলিতেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা! কি সেবা করিতে ইচ্ছা হয়?"

তিনি উত্তর দিতেন, "খেজুর মোরব্বা লইয়া আসিবে।"

ভক্তদের বলিতেন "যাও, তোমাদের ঘরে খাদ্য দ্রব্য যাহা আছে তাহা লইয়াই তোমরা সেবা কর।"

ভক্তগণ তাঁহার কুটীরের মধ্য হইতে নানা প্রকার সুমিষ্ট মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্য লইয়া বাহিরে গিয়া সেবা করিয়া আসিত।

ভক্তদের বালকবালিকারা অভিভাবক সঙ্গে অঘোরীবাবাকে দেখিতে আসিত।

জটালিবাবা বালক বালিকাদের বলিতেন, "তোমরা কি সেবা করিবে?"

তাহারা উত্তর দিত, "আমরা কিছু সেবা করিব না।"

এই বাক্য শুনিয়া তাহারা পরস্পর বলিত, "এ স্থান শ্মশানভূমি, সেকারণে এ স্থানের কোন খাদ্যদ্রব্য আহারে আমাদের রুচি হয় না। তদুপরি জটালি বাবা সেবার জন্য নরকপাল ব্যবহার করেন।"

আশ্রমের পার্শ্বে কেতকীবনে ডাহুক পক্ষী ডাকিলে অঘোরীবাবা ভক্ত বালক বালিকাদের বলিতেন, "ঐ শুনিতেছ, শ্মশানে ছেলে কাঁদিতেছে।"

তদুত্তরে বালক বালিকারা উত্তর দিত, "না বাবা! ঐগুলি ডাহুক পক্ষী"।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫।২৬ সালে জটালিবাবা কয়দিন রোগ ভোগ করিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন।

অঘোরীবাবা দেহরক্ষা করিলে সিউড়ির সঞ্জয় সাহা, পণ্ডিতপুরের সিদ্ধি মাহতো, করিধ্যার ভগুবণিক উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সমাধি কর্ম সম্পন্ন করেন। বক্রেশ্বর গ্রামের ব্রাহ্মণরাও কেহ কেহ ঐ সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিছুকাল পরে সমাধির উপরিভাগ সিমেন্ট দ্বারা বাঁধানো হয় এবং তাহাতে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া হয়। দেহ সৎকারের পর ডোম কাঙ্গালি প্রভৃতি বহু লোককে সেবা করানো হইয়াছিল।

যেস্থানে তাঁহার সমাধি আছে, ঐ জায়গার দক্ষিণভাগে একদা তাঁহার কুটীর ছিল। কুটীরের সম্মুখে যেস্থান মুক্ত ছিল, অঘোরীবাবার সমাধি ঐ স্থানে নির্মিত হইয়াছে।

অঘোরপন্থী সাধনায় কর্মযোগে সিদ্ধ হইয়া বহুশক্তি সঞ্চয় করিয়া অঘোরী বাবা শেষজীবনে বক্রেশ্বর শ্মশানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি ছুৎমার্গবর্জিত,

তিনি খাদ্যাখাদ্যের বিচার মুক্ত, তিনি অনাড়ম্বর কর্মযুক্ত, তিনি আহার ও বেশ বিলাস বাসনা রহিত, সুবোধ্য ভাষায় সরল অন্তঃকরণে ভাব প্রকাশিত করিয়া বর্ণে বা বৈভবে উচ্চ নীচ ভেদবুদ্ধি হইতে নিজেকে তিনি মুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন ও শিক্ষার তাঁহার জন্য বাহ্য রোষ কখন প্রকটিত, যশোলিপ্সা অবহেলিত, ধাতু নির্মিত তৈজস পত্র ব্যবহারে স্পৃহা উপেক্ষিত। তিনি দীনহীনসমাজে পরিত্যক্তজন কর্তৃক সর্বদা অতি আদৃত এবং তাহাদের সঙ্গলাভে উল্লসিত হইতেন। সর্বাবস্থায় বিভিন্ন ভাবেও অন্তর অবিকৃত সেই আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত নিজ ধর্মাচরণে অচল অটল বিশ্বাস রাখিয়া দৃঢ়চেতা সেই সৎসাহসী অঘোরীবাবা অকুতোভয়ে সর্বক্ষেত্রে সমগ্রজন সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত হইতে আনন্দ অনুভব করিতেন।

চক্রবর্তী বাবা ঃ—চক্রবর্তীবাবার জন্মভূমি মেদিনীপুর জিলায়। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রমথনাথ চক্রবর্তী। সংসারে যখন তিনি ছিলেন সেই সময় একটি ঘটনা তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ হয়। একদিন সংসারে কোন অশান্তির কারণে তাঁহার চঞ্চলা সহধর্মিণী তাঁহাকে সম্মার্জনী দেখাইয়াছিলেন। অর্ধাঙ্গিণীর এইরূপ আচরণে স্তম্ভিত হইয়া তিনি ভাবিলেন, "আজ সুস্থ দেহে যখন নিজ স্ত্রী আমার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিল তখন ভবিষ্যতে সে কি করিবে তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যায়।" সেইদিন হইতেই মনের তীব্র যাতনা ও লাঞ্ছনায় গভীরভাবে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্তীবাবা সংসার ত্যাগ করিলেন।

গৃহত্যাগ করিয়া চক্রবর্তীবাবা প্রথম তারাপীঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় গিয়া তিনি শ্মশানে কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নিজ বাসোপযোগী কুটীর ভূমি হইতে অনেকটা উচ্চে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্মশানের পার্শ্বে দ্বারকা নদী রহিয়াছে। বর্ষার সময় জলপ্লাবনে তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া যাহাতে অপর স্থানে যাইতে না হয়, সেই কারণে এইরূপ উচ্চমঞ্চের উপর নিজ আশ্রয় ও স্থির আসন রক্ষার জন্য তিনি ঐরূপে কুটীর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তথায় থাকিয়া কঠোর সাধনায় রত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার দেহের প্রতি কোন দৃষ্টি না থাকায় মস্তকের জটা উকুনকীটে পূর্ণ হয় এবং অযত্নে শরীর অত্যন্ত মলিন হইয়া যায়। দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর তিনি শ্মশানের তীরে এক উচ্চ স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র একখানি লাল পাড় ধুতিমাত্র।

তারাপীঠের এক পাণ্ডা ব্রাহ্মণ তাঁহার সেবার সকল ব্যবস্থা করিতেন। শ্মশানের পার্শ্বে উচ্চ ভূমির উপর চক্রবর্তীবাবা কুটীর নির্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে থাকিলে ক্রমে তাঁহার নিকট ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল। যাহা কিছু দ্রব্য

তাঁহার নিকট আসিত, যে-পাণ্ডা তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিতেন সমস্ত দ্রব্য তাঁহাকেই তিনি নিঃশেষে লইয়া যাইতে বলিতেন।

সাধুর সেবা করিয়া এক পাণ্ডা বহু দ্রব্য পাইতেছেন দেখিয়া অপর কোনো কোনো পাণ্ডা তাহার উপর ঈর্ষান্বিত হইলেন। চক্রবর্তীবাবা তথায় বাস করায় একটি পাণ্ডাই লাভবান হইতেছে—এই ভাবিয়া একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কোনো দুর্জন তাঁহার বাস গৃহে অগ্নি প্রয়োগ করে। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া কুটীরটিকে ভস্মীভূত করিল। সেই সময়ে অনেক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া চক্রবর্তীবাবা দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "পর্ণশালার উপরিভাগ ভস্ম হইল, কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, কয়টি কাঠবিড়াল খড়ের চালে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের জীবন নাশ হইল।" এই ঘটনার পর তিনি সে স্থান চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া বক্রেশ্বর তীর্থ অভিমুখে যাত্রা করেন।

চক্রবর্তীবাবা দেখিতে গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘকায় অল্পভাষী পুরুষ ছিলেন।

চক্রবর্তীবাবা তারাপীঠে কঠোরভাবে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং বিবিধ প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন। দৈহিক সুখ বা নিত্য আহার্য সেবা প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া কর্মে রত থাকিতেন। তিনি বলিতেন, "এ দেহের উপর দিয়া কত রৌদ্র জল বহিয়া গিয়াছে।"

তারাপীঠ হইতে বক্রেশ্বর যখন আসিলেন তখন চক্রবর্তীবাবার মাথায় জটা ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে উকুনকীটের নিমিত্ত তিনি বড় পীড়িত হইতেছিলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়াছিলেন। তদবধি তিনি কেশ ক্ষুদ্র রাখিতেন।

তারাপীঠে থাকাকালে চক্রবর্তীবাবা কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করায় তাঁহার দেহের বিশেষ ক্ষতি হয়। পাকস্থলীর স্নায়ুগুলি শুষ্ক হইয়া যায়। যথাসময়ে তাঁহার সেবা হইত না, পূর্ণ আহার তিনি করিতেন না, সেজন্য পাকাশয়তে পীড়া ঘটে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। চিকিৎসক রোগের কারণ বুঝিয়া কিছুকাল কেবলমাত্র দুগ্ধ জাতীয় তরল খাদ্য সেবা করিয়া পাকযন্ত্র পুষ্ট ও সবল করিতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এইরূপ সেবা যত্ন করিবার পর বক্রেশ্বরে তাঁহার দেহ সুস্থ হইয়াছিল। এই সময় চক্রবর্তী বাবার নিকট সেবা করিতে এক ব্রজবাসী ছিলেন।

চক্রবর্তীবাবা পাপহরা নদীর উত্তরে এক মন্দিরে প্রথম আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন কালীবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন। কিছুদিন পরে তিনি কালীবাটীর পূর্বে নিজ বাসোপযোগী এক কুটীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রথমে

তিনি অতি সাধারণ ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐ স্থানে কাল কাটাইতেন। নবনির্মিত বাসগৃহে তিনি শেষজীবন পর্যন্ত এক আসনে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

ঐ সময় এক ব্রজবাসী বৈষ্ণব চক্রবর্তীবাবার নিকট থাকিতেন। তিনি তাঁহার রন্ধনাদি সেবাকার্য করিতেন। সেবাকার্যে নিযুক্ত সেই ব্রজবাসী বৈষ্ণব কিছুকাল সেবাকর্ম করিবার পর একদা চক্রবর্তীবাবাকে বলিলেন, "আমি ভাগলপুর অঞ্চলে মন্দারে মধুসূদনতীর্থ দর্শন করিতে যাইব। ফলে ভ্রমণে আমার তিনমাস কাল কাটিবে।" ব্রজবাসীর অনুপস্থিতকালে পাক করিবার জন্য কালীবাটীতে সেবাব্রতী কালী মুখোপাধ্যায়কে চক্রবর্তীবাবা এক পাচক সন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি গোয়ালিয়ারা গ্রামের নলিন পতিতুণ্ডি মহাশয়কে ঐ কার্যে নিযুক্ত করেন।

প্রায় তিন মাস পরে ব্রজবাসী পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বে আশ্রমে যেরূপ কার্যে ঐ ব্রজবাসী নিযুক্ত ছিলেন চক্রবর্তীবাবা তাঁহাকে ঐ কার্যেই যুক্ত থাকিতে বলিলেন। কিন্তু নবনিযুক্ত ব্রাহ্মণ কর্মত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইল। চক্রবর্তীবাবা পাচককে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি পারিশ্রমিক স্বরূপ একশত মুদ্রা লইয়া ব্রজবাসীকে তাহার পূর্ব কর্ম করিতে দাও।" পাচক ব্রাহ্মণ কিন্তু কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন চক্রবর্তীবাবা ব্রজবাসীকে বলিলেন, "আপনি এস্থানে থাকিয়া সেবা করুন এবং ভজন পূজন করিতে থাকুন।" ব্রজবাসী তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া নিজ প্রয়োজনীয় স্বল্প জিনিষ লইয়া, অবশিষ্ট নিজ দ্রব্যাদি ঐ আশ্রমে রাখিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রাতে চক্রবর্তীবাবা নিজ নিত্যকর্ম সমাধা করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পরে গৃহদ্বার অর্ধ উন্মোচিত রাখিতেন। আগন্তুকগণের সহিত তিনি ঐ সময়ে মিলিত হইতেন।

তিনি অধিক পরিমাণে দুগ্ধসেবা করিতেন। কোনো এক ভক্ত তাঁহাকে উত্তম একটি গাভী দান করিয়াছিল। আশ্রমে সেই গাভীর অত্যধিক যত্ন ছিল। চক্রবর্তীবাবার অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্বল্প আহার ছিল। দিবাভাগে অতি অল্প অন্ন, মৎস্য, দুগ্ধ গ্রহণ করিতেন, রাত্রিতে লুচি ফল মিষ্টাদি সামান্যই সেবা করিতেন। উচ্ছিষ্ট পাত্রস্থিত তাঁহার সেবার অবশিষ্ট আহার্য দাসীপুত্র গোসেবকের সেবার নিমিত্ত তিনি নিজ হস্তে বাহির করিয়া দিতেন।

তাঁহার আশ্রমে এক বিড়াল ছিল। সেবার সময় বিড়ালটি তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিত। কিছু দুগ্ধ মৎস্য তাহারও সেবায় লাগিত।

এই গ্রামের কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে চক্রবর্তীবাবা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ তামাক তাহার হস্তে তুলিয়া দিতেন। সেই লোকটি তামাকের ক্ষুদ্র পিণ্ড লইয়া সেবা করিতে চলিয়া যাইত। ভক্তগণ তাঁহার সেবার জন্য অতি প্রিয় গয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের তামাক পাঠাইতেন বা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন। তিনি আফিম পাইতেন এবং তামাক অধিক সেবা করিতেন।

চক্রবর্তীবাবা বৈকালে পাপহরা নদীর উত্তরতীরে নিজ আশ্রমের বহির্ভাগে পদচারণা করিতেন। সেই সময় অনেকে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইত। তন্মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সেবার সুঘ্রাণযুক্ত উৎকৃষ্ট তামাক লইয়া তথায় সেবা করিতে বসিয়া যাইত।

যে-বাগ্দিবালক চক্রবর্তীবাবার গোচারণ করিত এক সময় পাপহরা নদীতে স্নানকালে আশ্রমের সম্মুখভাগে এক স্বর্ণ অঙ্গুরী সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। আশ্রমের পাচক উহা দেখিয়া লুব্ধ হইয়া বালকের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লয়। গোসেবক বালক বহু অনুরোধ করিলেও পাচক ব্রাহ্মণ তাহা বালককে ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হয়। বালকের বহু কাতর অনুনয়বিনয় পাচক না শুনায় চক্রবর্তীবাবা বালকের হস্তে দশমুদ্রা দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান করেন।

গোচারণে নিযুক্ত বালক এক সময় অসুস্থ হইয়া তিন মাস শয্যাগত ছিল। কিছুতেই জ্বর উপশম হইতেছিল না। তাহার মাতা আশ্রমের পরিচারিকা ছিল। একদিন সেই অসুস্থ বালক অতি কষ্টে গৃহ হইতে মাতার নিকট চলিয়া আসিল। বালককে দেখিয়া চক্রবর্তীবাবা পরিচারিকাকে বলিলেন, "তোমার পুত্র অতি দুর্বল, সে ভূমিতে পড়িয়া যাইলে দেহান্ত হইবার সম্ভাবনা।"

এই কথা শুনিয়া পুত্রের অসুস্থ সংবাদের কথা বৃদ্ধা মাতা চক্রবর্তীবাবাকে বলিলেন। এই বাক্য শুনিয়া গৃহমধ্য হইতে মিছরির এক বৃহৎ খণ্ড লইয়া তিনি মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই মিছরি ছেলেকে খাইতে দিবে। ইহাতেই তোমার ছেলের জ্বর আরোগ্য হইবে।" ইহার কিছুদিন পরেই বালক আরোগ্য লাভ করিল।

চক্রবর্তীবাবার নিকট উপকৃত ব্যক্তিগণ বিবিধ প্রকার দ্রব্য, ফল, মূল ইত্যাদি লইয়া আসিত। তাঁহার পাচককে তিনি উদ্বৃত্ত বস্তু বিতরণ করিতে বলিতেন। কখনো অধিক সঞ্চিত থাকিলে তিনি স্বহস্তে ফল মিষ্টাদি দান করিতেন।

চক্রবর্তীবাবাকে যাচ্ঞা করায় কালীবাটীর সেবক কালীচরণ মুখোপাধ্যায়কে গৃহ নির্মাণ করিতে তিনি গোপনে একশত টাকা এবং পরিচারিকাকে গৃহাচ্ছাদন করিতে কুড়ি টাকা এক সময় দিয়াছিলেন।

কাটোয়ার সন্নিকটে সীতাহাটি গ্রামের একধনী লোক চক্রবর্তীবাবার সেবার জন্য উৎকৃষ্ট পুরাতন চাউল এবং অপরাপর সামগ্রী নিয়মিত পাঠাইতেন।

প্রতিবৎসর অজয়নদীতীরে জয়দেবকেন্দুবিল্বগ্রামে পৌষ সংক্রান্তির দিনে স্নান করিতে বহু বৈষ্ণব ভক্তের সমাগম হয়। ঐ সময় বক্রেশ্বর হইতে সেবায়েতগণ এই ক্ষেত্রের জন্য যাত্রী সংগ্রহ করিতে ঐ তীর্থে উপস্থিত হইতেন।

এক বৎসর এ স্থানের জনৈক সেবায়েত আরও তিনজনের সঙ্গে তীর্থ যাত্রীর সন্ধানে একত্র জয়দেব তীর্থ যাত্রা করিবেন—স্থির হয়। যাইবার নির্দিষ্ট দিনে অপর তিনজন সেবায়েত চতুর্থ সেবায়েতটিকে ছাড়িয়াই গোপনে চলিয়া যান। পরিত্যক্ত সেবায়েতটি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চক্রবর্তীবাবার সম্মুখে আসিয়া বিষণ্ণ বদনে নীরবে বসিয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণকে বিমর্ষ অধোমুখে চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, চক্রবর্তী-বাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমায় অধীর দেখিতেছি কেন?" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে সকল ঘটনা সবিস্তারে বলিলেন এবং নিজের অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন। এই কথা শুনিয়া চক্রবর্তীবাবা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি বর্ধমান রেলষ্টেশনে যাও। তথায় যাত্রীর সন্ধান পাইবে।"

উক্ত সেবায়েত এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার বাক্যানুসারে দ্রুত বর্ধমান রেল-ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া জয়দেব ও বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ যাত্রীদের উভয়স্থান পরিদর্শন করাইয়া সেই সেবায়েত এককালে চারিশত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর ধামের দক্ষিণাংশে ঝাঁপড়তলা নামে এক গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার এক কৈবর্ত মণ্ডল চাষী চক্রবর্তীবাবার নিকট সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বসিয়া থাকিত। সে ব্যক্তি হাঁপকাস রোগে পীড়িত ছিল। সে একদিন চক্রবর্তীবাবাকে নিজ দুঃখের কথা বলিয়াছিল। চক্রবর্তীবাবা তাহাকে মদ্যপান করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার আদেশ পালন করিয়া মণ্ডল কিছু সুস্থ হইয়াছিল।

অক্ষয়বটের কিঞ্চিৎ পূর্বভাগে এক কুটীরে গৌরদাসবাবাজী নামে এক স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বৈষ্ণব বাস করিতেন। তিনি এই তীর্থে দীর্ঘকাল ছিলেন। একদিন এক নরসুন্দর আসিয়া চক্রবর্তীবাবার ক্ষৌরকর্ম করিতেছিল। ঐ সময় গৌরদাসবাবাজী ঐ দিকে যাইবার কালে নরসুন্দর চক্রবর্তীবাবাকে ক্ষৌরকর্ম করি-তেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "নরসুন্দর! তোমায় আমার নিকট আসিবার জন্য দুই তিন দিন লোক পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি আইস নাই। অগ্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া অদ্য তুমি এই স্থানে ক্ষৌরকর্ম করিতেছ?"

এইরূপ বাক্য শুনিয়া চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "যাহার অন্তরে এত ক্রোধ তাহার সংসার করা ভাল।"

এই ঘটনার একমাস পরে গৌরদাসবাবাজী কাটোয়ার সন্নিকটে আকাই হাট গ্রামে গিয়া এক বৈষ্ণবীলাভ করিয়া তথায় প্রায় কুড়ি বৎসর সংসারজীবন অতিবাহিত করিয়া লোকান্তরিত হন।

চক্রবর্তীবাবা বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। রোগাক্রান্ত লোকেরা তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, "চিকিৎসকগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকট যাও। বক্রেশ্বরদেব রহিয়াছেন তাঁহাকে ভক্তি করিও; তিনি কৃপা করিবেন।"

তিনি এরূপ বলিলেও তাঁহার নিকট বহুজন নানাবিধ বাসনা লইয়া আসিত। দূর দূরান্ত হইতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

রামপুরহাটের এক ধনী ব্যক্তি খুনের দায়ে আসামী হওয়ায় বিপন্ন হয়। সে ব্যক্তি অনন্যোপায় হইয়া চক্রবর্তীবাবার শরণাপন্ন হয়। জনৈক স্থানীয় সেবায়েতের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলে সেই সেবায়েত তাহাকে চক্রবর্তীবাবার নিকট লইয়া গিয়া তাহার বক্তব্য ব্যক্ত করেন। চক্রবর্তীবাবা সকল কথা শুনিয়া সেই ধনী পুরুষকে তিন দিন পরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। সেই বাক্যানুসারে উক্ত ব্যক্তি চতুর্থ দিনে আসিয়া সেই সেবায়েতকে সঙ্গে লইয়া চক্রবর্তীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করে।

চক্রবর্তীবাবা তাহাকে বলিলেন, "মকদ্দমা উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করিবে ও সর্বপ্রকার বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।"

চক্রবর্তীবাবার কথানুযায়ী সেই ব্যক্তি আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে এবং প্রণামীস্বরূপ কিছু অর্থ তাঁহাকে দেয়। তিনি সেই অর্থ না লইয়া সেবায়েতকে টাকা কয়টি লইতে আদেশ করেন।

বক্রেশ্বর নদীর উত্তরভাগে গোয়ালিয়ারা গ্রামের এক বয়স্কা ব্রাহ্মণী মধ্যে মধ্যে সেবার বস্তু কিছু হাতে লইয়া চক্রবর্তীবাবার দর্শন করিতে আসিতেন। সেই ব্রাহ্মণী একদিন নিজ বিবাহিতা কন্যা ও তৎসঙ্গে আরও কয়টি নব বিবাহিতা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া চক্রবর্তীবাবার চরণ দর্শনে আসিয়াছিলেন। সাধুর নিকট মাতার অভিপ্রায়, যাহাতে কন্যাগণের সন্তান লাভে সংসার স্থাপিত হয়।

চক্রবর্তীবাবা ব্রাহ্মণীর বাক্যের কোন উত্তর না দেওয়ায় মাতা কন্যাগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার আশ্রমের পশ্চিমপার্শ্বের কালীবাড়ীতে যাইয়া বসিলেন। সন্ধ্যা

পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়া পুনরায় চক্রবর্তীবাবার নিকট কন্যাদের লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণী সাক্ষাৎ করিলেন।

চক্রবর্তীবাবা নারীদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। নবযুবতীদের সন্তান লাভ হউক মাতার এই কামনা অত্যন্ত বলবতী দেখিয়া তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "যাও তিন মাস পরে।" এই কথা মাত্রেই তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া পরে চক্রবর্তীবাবার আশীর্বাদে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন।

এক সময় উপরিউক্ত ব্রাহ্মণীর এক দৌহিত্র রোগাক্রান্ত হয়। গোয়ালিয়ারা গ্রামে মাতুলালয়ে থাকাকালে চক্রবর্তীবাবার নিকট মাতামহীর সঙ্গে বালক আসিত। একবার ভ্রাতার অসুস্থ সংবাদ দিতে সেই বালক বক্রেশ্বরে চক্রবর্তী-বাবার নিকট আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। সে আসিয়া শুনিল, তিনি দুবরাজপুর আনন্দ কাননে গিয়াছেন। দুবরাজপুর গিয়া চক্রবর্তীবাবার কোনো সন্ধান লইতে না পারিয়া বালক হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে।

ইহার অল্পকাল পরে চক্রবর্তীবাবা এই তীর্থে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণী রুগ্ন বালকের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিল।

তিনি সেইবাক্য শুনিয়া বলিলেন, "আমায় সংবাদ দিলে অন্তত রোগের এ যাত্রা হইতে বালক মুক্ত হইত।"

যাহা হউক অসুস্থ বালক পূর্বেই চিকিৎসকের সাহায্যে কিছু সুস্থ হইয়াছিল।

গোয়ালিয়ারা গ্রামের জনৈক পতিতুণ্ডি ব্রাহ্মণের প্রথম শিশুপুত্রের বসন্ত রোগ হয়। এই কঠিন রোগে ঐ নবজাত শিশু মৃতপ্রায় হওয়ায় মাতার কাতর রোদনে ব্যাকুল হইয়া সেই গৃহের কোনো ব্যক্তি সত্বর আসিয়া চক্রবর্তী বাবাকে এই সংবাদ দিল। তিনি সেই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "যাও ভয় নাই।" পরে সেই শিশু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিল।

গোয়ালিয়ারা গ্রামের এক রজক সস্ত্রীক আসিয়া চক্রবর্তীবাবার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দেখিয়াই চক্রবর্তীবাবা তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "পূর্বে তুমি নষ্ট করিয়াছ, সন্তান আর হইবে না।"

চক্রবর্তীবাবা তারাপীঠে থাকাকালে এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বামী স্ত্রী বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সঙ্গে লইয়া নিজ বিষয়সম্পদ গুরুকে দান করিয়া সংসার ত্যাগ করত তারাপীঠে তাঁহার নিকট আসেন। চক্রবর্তীবাবা তাঁহাদের সকলকে একত্র গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কি গুরুর আদেশ লইয়া সপরিবারে গৃহ ত্যাগ করিয়াছ?"

তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা! গুরুর সম্মতি অনুসারেই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

তাঁহারা সকলে কঙ্কালিতলা পীঠস্থানে শেষজীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ভ্রাতুষ্পুত্রী উচ্চ সাধিকা বৃদ্ধা ভৈরবী মাতা এক্ষণে ঐ তীর্থে নিজ আশ্রমে বাস করিতেছেন।

রাণীগঞ্জ হইতে মধ্যে মধ্যে এক ব্যবসায়ী চক্রবর্তীবাবার নিকট আসিত। তাহার ব্যবসায় কোন দ্রব্য কখন ক্রয়বিক্রয় করিলে সুবিধা হইবে তাহাই জানিতে আসিত। বণিক এইরূপে নিজ ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ায় নানাবিধ সামগ্রী চক্রবর্তীবাবার নিকট প্রায় নিয়মিত দান করিত।

শিবচরণ নামে এক গৃহী ব্রাহ্মণ কালীবাড়ীতে থাকিতেন। তিনি বক্রেশ্বর শ্মশানে সাধন নিমিত্ত একটি ঘর করাইয়াছিলেন। একদিন রাত্রিকালে ঐ ঘরে যাইয়া সাধন করিবার ইচ্ছা করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ অধিক রাত্রিতে কিছু কাল শ্মশানে থাকার পর ভীত হইয়া ঘর হইতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া সম্মুখে পাপহরানদীর উষ্ণজলে ঝাঁপ দিয়া পতিত হয়।

চক্রবর্তীবাবা নিশীথ রাত্রে ব্রাহ্মণের আর্তস্বর শুনিয়া নিজ গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে অভয় ও আশ্বাস দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ শ্মশানের সে কুটীরে কদাপি আর যায় নাই।

চক্রবর্তীবাবার দেহ এরূপ দুর্বল ছিল যে সজোরে হস্তের উপরিভাগ হইতে নিম্নে অঙ্গুলি লইয়া যাইলে লোমকূপ হইতে স্বেদ নির্গত হইত।

স্থানীয় এক সেবায়েত তাঁহার নিকট প্রায় বসিয়া থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় চক্রবর্তীবাবা সেই সেবায়েতকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্রই বাড়ী যাও।"

এই কথা শুনিয়াও তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার কোন উদ্যোগ না দেখিয়া চক্রবর্তীবাবা সেবায়েতকে পুনরায় বলিলেন, "অতি সত্বর আজ তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।"

সেবায়েত গৃহে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা মরণাপন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। অতি আকস্মিকভাবেই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

একসময় উক্ত সেবায়েত কয়েকদিন চক্রবর্তীবাবার নিকট উপস্থিত হন নাই। কয়দিন পরে তাঁহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কয়দিন এস্থানে আস নাই কেন?"

সেবায়েত বলিলেন, "আপনার আশ্রমে যে-ফলগুলি থাকে তাহা পচিয়া

নষ্ট হয়, ঐগুলি বিতরণ করিতে পাচককে বলিয়াছিলাম, তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই আসি নাই।

চক্রবর্তীবাবা বলেন, "দ্রব্য নষ্ট করা কোনপ্রকারে উচিত নয়। সময়ে লোককে তাহা সেবা করিতে দেওয়াই কর্তব্য।"

একদিন উক্ত সেবায়েত কিছু রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন। চক্রবর্তীবাবা তাঁহাকে বলিলেন, "রাত্রি হইয়াছে এইবার ঘরে যাও।"

সেবায়েত উঠিয়া বাহিরে যাইলে তিনি গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজ কাপড়ের এক প্রান্ত ভাগ দিয়া মশা তাড়াইয়া মশারি ফেলিয়া দিলেন।

সেবায়েত বাহির হইতে জানালা দিয়া দেখিতেছিলেন। ভিতরে তিনি শুনিলেন, চক্রবর্তীবাবা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "তোমায় এখন আসিতে বলি নাই, কেন আসিলে?" কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চক্রবর্তীবাবা গৃহমধ্যে একক এ কথা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিতেন।

একবার আসানসোল হইতে এক ভদ্রলোক তাঁহার মনোকথা ধরিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে চক্রবর্তীবাবার সম্মুখে আসিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। চক্রবর্তীবাবা স্নান করিতে উঠিবার সময় সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ? মাতাকে জুতা মারিয়াছ, সেই অপরাধে তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে। বক্রনাথের কাছে যাও, তিনি যদি তোমায় ক্ষমা করেন।"

একদিন সকলের সহিত বসিয়া চক্রবর্তীবাবা বাক্যালাপ করিতেছেন এমন সময় তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে! আমার নিকট একজন আসিতেছে," এই বলিয়া তিনি একটি জলপাত্র লইয়া দূরে চলিয়া যান। কিছুক্ষণের মধ্যে একব্যক্তি আশ্রমে আসিয়া চক্রবর্তীবাবার সন্ধান লইতে থাকিল, এবং আশ্রমে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। চক্রবর্তীবাবা ঘুরিয়া আসিয়া নিজ আসনে বসিলেন। সেই সময় নবাগত লোকটি নিজ রোগের কথা চক্রবর্তী-বাবাকে জানাইল।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "চিকিৎসকগণ বহু ব্যয় করিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছে, তাহাদের নিকট যাও।"

রোগী বহু অনুনয় করিয়া বলিল, "সে সকল চেষ্টা আমার ব্যর্থ হইয়াছে।"

তদুত্তরে চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "বাবা বক্রেশ্বরদেব আছেন, সেই দেবস্থানে শরণাগত হইয়া পড়িয়া থাক, যদি তাঁহার কৃপালাভ হয়।"

এই বাক্যানুসারে রোগী কিছুকাল বক্রনাথ স্থানে কঠোরভাবে কাল কাটাইল,

কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় চক্রবর্তীবাবাকে সেই কথা জানাইল। অসহায় রোগীকে শেষে তিনি কৃপা করায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

একবার একজনের একটি মাত্র পুত্র যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ হয়। সেই ব্যক্তি চক্রবর্তী-বাবার চরণে শরণাগত হইয়া একমাত্র পুত্রের নিরাময়ের জন্য তাঁহাকে বহু কাতর অনুনয় বিনয় করিয়া নিজ দুঃখ জানাইল। চক্রবর্তীবাবা করুণা করিয়া তাহার পুত্রকে নীরোগ করেন।

শুনা যায়, এই দুরারোগ্য ব্যাধি দেহে আশ্রয় লইলে রোগীর সহস্রদিন আয়ু অবশিষ্ট থাকে। তিনি রোগীকে নিরাময় করিতে গিয়া আপনদেহে রোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষে নিজেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতার এক ইহুদি সাহেব একটি গম পেষণের কলের ও এক বৃহৎ অট্টালিকার মালিক ছিলেন। কালে ব্যবসায় সংক্রান্তে তাঁহার ঐ আবাসবাটী ও কল তিনলক্ষ টাকা ঋণের দায়ে বন্ধ হয়। সেই ইহুদি ব্যবসায়ী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার কার্যে নিযুক্ত এক কর্মচারী বিপন্ন প্রভুকে বলিল, "বক্রেশ্বর তীর্থে এক উন্নত মহাপুরুষ আছেন, তাঁহার আশ্রয় লইলে হয়ত কোন উপায় হইতে পারে।"

ইহুদি সাহেব কর্মচারীকে বলিলেন, "বিপদমুক্ত হইবার জন্য আমি যেকোন স্থানে যাইতে ইচ্ছুক, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া চল।"

কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ইহুদি সাহেব বক্রেশ্বরে চক্রবর্তীবাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে নিজ বিপদ কথা প্রকাশ করিলেন।

চক্রবর্তীবাবা প্রথমে তাহাকে কটুভাষায় বিদায় করিতে চাহিলেন, কিন্তু ইহুদি সাহেব এক অবস্থায় থাকিয়া নিজ দুঃখ জানাইতে লাগিলেন। ধনী ইহুদির নতজানু হইয়া কাতরোক্তি দেখিয়া চক্রবর্তীবাবার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "যাও তোমার বাস করিবার বাটী ঋণদায়ে চলিয় যাইবে। কিন্তু গমপেষণের কল কারখানা রক্ষা পাইবে, এবং তাহা তোমার থাকিবে।" মকদ্দমার দায়ে একে একে অন্য সব বিক্রয় হইয়া গেল, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায়স্বরূপ কল কারখানা রক্ষা পাইল।

ঐ সময় ইহুদি সাহেবের স্ত্রীপুত্র রোগাক্রান্ত হইয়াছিল তাহারাও নীরোগ হয়। সর্বভাবে শান্তি পাইয়া বিপদ মুক্ত হইয়া সাহেব কৃতজ্ঞতাপূর্বক চক্রবর্তী-বাবাকে সেবার জন্য বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য সোনার মোহর প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন।

বর্ধমান জিলায় অজয়নদী তীরে পাণ্ডবেশ্বর গ্রামের নিকট রামনগর গ্রামের এক ধনী কৈবর্ত তথাকার মিশ্র ব্রাহ্মণদের সহিত এক ভীষণ মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়ে। ধনী কৈবর্ত চক্রবর্তীবাবার নিকট আসিয়া সকল কথা প্রকাশ করিল। অকপটে সকল কথা জানাইয়া যখন ধনী ব্যক্তিটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময় তাহাকে চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "তুমি যাইওনা, মোটর গাড়ী আরোহণ করিয়া মিশ্র সপরিবারে বক্রেশ্বর আসিতেছে।"

কিছুক্ষণ পরে মিশ্রব্রাহ্মণ তথায় আসিলে চক্রবর্তীবাবার অনুরোধে ধনী কৈবর্তের সঙ্গে মকদ্দমা মিটাইয়া লইয়া নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল।

একদা চক্রবর্তীবাবার নিকট এক রুগ্ন ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া আসিয়া নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করিল। তদুত্তরে চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "যাহার নিকট তুমি অপরাধী হইয়াছ, তাহার নিকট নিজ দোষের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলে তবে যদি কিছু ফল হয়।"

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বা কাহার নিকট যাইতে হইবে আপনি আদেশ করিলেই তাহা পালন করিব।"

তদুত্তরে চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "পিতামাতার নিকট অপরাধ করিয়াছ, তাঁহাদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করিবে।"

তাঁহার বাক্যানুসারে কর্ম করিয়া সে ব্যক্তি ফললাভ করিয়াছিল।

এক রুগ্ন ব্যক্তির বক্ষের দোষ হওয়ায় সে চক্রবর্তীবাবার নিকট আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইল।

চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "বাবা, রোগাক্রান্ত হইয়াছ। একজনের উপর ভক্তি নিষ্ঠা লইয়া শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে ফল লাভ হইবে। মন চঞ্চল করিয়া নানা স্থানে ঘুরিলে কোনই ফল হইবে না।"

রোগী বলিল, "আপনার উপরেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।"

তদুত্তরে চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "একজনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিও, নিশ্চয়ই ফল লাভ হইবে।"

চক্রবর্তীবাবার কৃপায় রোগী কালে সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়।

একদা একব্যক্তি আসিয়া চক্রবর্তীবাবাকে বলিল, "এক গ্রহাচার্য গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আমার পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য আপনি আদেশ করিলে, আমি তদনুরূপ করিব। যাহাতে আমার পুত্র রক্ষা পায়, দয়া করিয়া তাহাই করুন।"

চক্রবর্তীবাবা চিন্তা করিয়া বলিলেন, "গণনা সত্যই হইয়াছে, তবে প্রতিকার করিবার একমাত্র উপায়, ভগবৎ পদে আশ্রয় লওয়া।

চক্রবর্তীবাবার আদেশ অনুসারে বালকের পিতা বিপদ ঘটিবার দিন যখন নানা উপচারে যাগযজ্ঞ করিতেছিল সেই সময় এক কালসর্প আসিয়া যজ্ঞ স্থানের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া, এক ছাগকে বিষদন্তে দংশন করিল। ফলে ছাগের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিল। ইহার পর বালকের আর কোনো বিঘ্ন হয় নাই।

বক্রেশ্বর হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে লাউজোর গ্রামের এক ব্যক্তির স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয়। নানাস্থানে চিকিৎসা করাইয়া মহিলাটি সুস্থ হইতে পারে নাই। নিরুপায় হইয়া লোকটি অবশেষে চক্রবর্তীবাবার শরণাপন্ন হইল।

চক্রবর্তীবাবা রোগিণীর সকল অবস্থা শুনিয়া লোকটিকে বলিলেন, "যাও তোমার স্ত্রী নীরোগ হইবে।"

সেই লোক সৎমুখে এই বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাইল। গৃহে প্রবেশ করিয়া অতি আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিল, তাহার রুগ্না স্ত্রী সুস্থ হইয়া গৃহাঙ্গন মার্জনা করিতেছে।

বক্রেশ্বর হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ পশ্চিমে নাকড়াকোন্দা গ্রাম। তথা হইতে এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক মধ্যে মধ্যে চক্রবর্তীবাবার নিকট আসিতেন। শিক্ষক একদিন চক্রবর্তীবাবাকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা! ইন্দ্রিয় শৈথিল্য নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়। কোন্ উপায়ে তাহা দূর করা যায়?"

চক্রবর্তীবাবা উত্তর দিলেন, "বাবা! সেজন্য চিন্তা করিও না, এরূপ অবস্থায় মনে করিবে প্রস্রাব হইয়া গিয়াছে।"

জনৈক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আসিয়া চক্রবর্তীবাবাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিতেন, "সিদ্ধ পুরুষ? কিরূপ সিদ্ধ, অসিদ্ধ না অর্ধসিদ্ধ!" তাঁহাকে এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উপহাস করিতে শুনিলেও চক্রবর্তীবাবা কোন উত্তর না দিয়া নীরবে বাক্যবাণ সহ্য করিতেন।

একদিন সেই সাধু-নিন্দুক চক্রবর্তীবাবার পশ্চাৎভাগে আসিযা পূর্বের ন্যায় বিদ্রূপ করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি হওয়ায় চক্ষু ও মুখমণ্ডল তাঁহার রক্তবর্ণ হইল এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি সজোরে বলিলেন, "আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, আমি তোমায় নিমেষে ভস্মের স্তূপে পরিণত করিতেছি।"

এরূপ রুদ্রমূর্তি ও রূঢ়বাক্য শুনিয়া লোকটি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ হইতে পলায়ন করিল।

নলহাটির সন্নিকটে এক ধনী ভূস্বামী বাস করিত। তাহার পুত্রের অকাল মৃত্যুযোগ রহিয়াছে জ্যোতিষী গণনা করিয়া তাহা বলিয়াছেন। একমাত্র পুত্রের ঐরূপ ঘটিবে এই দুর্ভাবনায় চক্রবর্তীবাবার নিকট ধনী সাক্ষাৎ করিতে আসে।

চক্রবর্তীবাবার গৃহদ্বারে এক সেবায়েত বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধনী জিজ্ঞাসা করিল, "চক্রবর্তীবাবা কোথায় ?"

সেবায়েত উত্তর দিলেন, "গৃহাভ্যন্তরে আছেন।"

বিপন্ন পুরুষ এই কথা শুনিয়া বিনা অনুমতিতেই কুটীরদ্বার উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চক্রবর্তীবাবা স্বকর্মেরত থাকাকালে বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি" ? ধনী উত্তর দিল, "আমি অমুক স্থানের জমিদার।" ধনীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চক্রবর্তীবাবা বলিলেন, "তুমি এস্থান হইতে বাহিরে যাও, তোমার পুত্রের মৃত্যু হইবে, তুমি অন্ধ হইবে এবং তোমার ভূসম্পদ ক্ষয় হইবে।" অনেক অনুনয়বিনয় সত্ত্বেও চক্রবর্তীবাবা এ বাক্যের কোনো পরিবর্তন করিলেন না। তাঁহার বাক্যমত একে একে সকলই ঘটিল। ধনীর পুত্র মৃত হইল, ধনী নিজে অন্ধ হইল, তাহার ভূসম্পদ অনেক ক্ষয় হইল। এবম্বিধ অবস্থায় সেই ধনীটীর ভ্রাতা অবশিষ্ট সকল সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন।

চক্রবর্তীবাবা বলিয়াছিলেন, "আমার দেহান্ত হইলে পতিতুণ্ডী মহাশয়, পাচক এবং পরিচারিকা গাভী ও বৎস লইবে।"

চক্রবর্তীবাবা গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন গুরুকরণ করেন নাই। তাঁহার উপনয়নের সময় যে-গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন সেই মন্ত্রই তিনি জপ করিতেন। তারাপীঠে কঠোর সাধনকালে তারামাতার আদেশ পাইয়াছিলেন, "মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা না লইলে আমার দর্শন কিরূপে পাইবে।"

চক্রবর্তীবাবা দেহান্তের একমাস পূর্বে বক্রেশ্বরের প্রাচীনা ভৈরবী জয়ামাতার নিকট তিনি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। চক্রবর্তীবাবার ন্যায় প্রাচীন ও প্রবীণ পুরুষকে জয়া ভৈরবীমাতা দীক্ষা দিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধে মাতৃমন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন।

চক্রবর্তীবাবার নিকট যে সকল ভক্ত আসিত তিনি তাহাদের সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত সৎবাক্য দ্বারা উপদেশ দান করিতেন :—

মনুষ্যের কর্তব্যবোধ এবং কৃতজ্ঞতা পালন অবশ্যকরণীয়। যে-কর্মে একাগ্র ভাবে মনোযোগ না দেওয়া যায় তাহা কদাচ সুসিদ্ধ হয় না। ধর্মপথে আসিয়া যে-মন্ত্র সাধন করিতে হইবে তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ না করিলে, ফললাভে

সংশয় থাকে। দিবারাত্র আহারনিদ্রা দৈহিকসুখ সম্ভোগ বা অধিক বৃথা বাক্যালাপে মন দিলে সাধনকালে কর্ম মন্থর গতিতে চলে। নিজ কর্ম যতদিন সুসিদ্ধ না হয় অপর কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। সাধনকালে মাথায় জটা হইল, আসনবসন মলিন হইল, দেহ অপরিষ্কার রহিল, এ বিষয়ে চিন্তার অবসর থাকে না। কিরূপে ও কবে স্বকর্মে ফললাভ হইবে এই চিন্তায় আত্মহারা হইয়া কর্মযুক্ত না থাকিলে সাধনার পরিণতির পথে বিঘ্ন আসে। এপথ দুরূহ ও দুর্গম, কিন্তু একনিষ্ঠ ব্রতে বিপুল আনন্দদায়ক ও চিত্তের উৎকর্ষ লাভের একমাত্র সহায় হয়। স্বকর্মসাধন করিতে হইবে, সে বিষয়ে অপরে আভ্যন্তরিক উন্নতিবিধানে কিছু যখন করিতে পারিবে না তখন আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বধর্ম পালন আনন্দদায়ক হয়। সাধনকালে ক্লেশবরণ চিন্তার বস্তু নহে। সেবিষয়ে নিমজ্জিত হইলে কোন অসুবিধা মনে উদয় হয় না। নিজ বাহ্য প্রয়োজনে কি আবশ্যক হইবে তাহাতেও দৃষ্টি থাকে না। কেবল কর্মচিন্তায় মগ্নমন আত্ম-সুখে উন্নত ও তৎসময়োচিত কর্ম পালনে ব্রতী রহে। সাধনকালে বাহিরের বিবিধ পরীক্ষা বিপদ ঘটাইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়। সে সময় একমাত্র ভগবৎ চরণে সকল সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে নিজেকে অসহায় জ্ঞান করিয়া যাঁহার স্মরণে থাকা যায়, তাঁহাকেই সকল নিবেদন করিয়া একাগ্র মনে সৎআশ্রয়ে থাকিলে, সকল বিপদ অপসারিত হয়। যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা অন্তর্দেবতাকে জানাইব। তিনি সর্বমঙ্গলময়, সকল অবস্থা তিনি জ্ঞাত রহিয়াছেন। যথা প্রয়োজন তিনি প্রতিবিধান করিবেন। স্বধর্ম পালনে কোনো নিন্দা গ্লানি নাই। ইহা স্বচ্ছ নির্মল সর্বানন্দদায়ক। পরিণাম সুখকর হইলে সে কর্ম করিতে কোন ক্লেশবোধ হয় না, অবসাদ আসে না, আত্মভোগের কোন চিন্তা মনে স্থান পায় না। সৎ-এ, একে যুক্ত থাকায় মন গভীর সুখাশায় নিমগ্ন থাকে। জীবনে দুর্লভ বস্তুলাভ হইবে এই আশায় বাহ্য চিন্তা বা ক্ষণকালের সুখ ত্যাগ করিয়া গভীর আনন্দে কর্ম শীঘ্র অগ্রসর হউক সে বিষয়ে মন নিয়োজিত থাকে। সাধন কালে অবলম্বন কি, বা তাহার ফল কিভাবে লাভ করা যায় তাহাই বলিলাম।

কর্ম সমাধা হয় না, যতদিন এ দেহ ধারণ করা যায়, যাহার যত সাধ্য সে মনুষ্য তত আরাধনা করিতে থাকে। বাসনা সকল সময়ে মনকে প্রলুব্ধ করিতে থাকে। সেই কারণে কঠোর সাধন করিয়া অন্তিমে যশ বা বাহ্য ঐশ্বর্য লাভ করিয়া ভুলিয়া থাকিলে প্রকৃত অমৃতময় অক্ষয় আনন্দ দূরে রহিয়া যায়। কঠোর একনিষ্ঠ প্রযত্নে পার্থিব সকল সুখসম্ভোগ লাভ হইতে পারে কিন্তু যেন লক্ষ্য থাকে

ভগবৎ চিন্তা বা তাঁহার সান্নিধ্যলাভে মন বিচলিত না হয়। দেহবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া অভ্যন্তরে অন্তরাত্মার সহিত পরম দেবতাজ্ঞানে সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, সদা অভিনব আনন্দ ও সুখ বর্ধিত হয়। ইহা বৈরাগ্য সৎজীবন পথাবলম্বনের সুখময় শেষ ফল। এতদ্ভিন্ন অপর কোন আশ্রয় নাই বা আকাঙ্ক্ষার কাম্য বস্তু কিছু নাই। ইহাই চরম ও পরম সাধনের পরিণতি।

বৈরাগ্য জীবনযাপনের জন্য সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া সকলে মুক্ত পুরুষ হয় না। যাহার যেরূপ সংস্কার, সে তদ্রূপ কর্মে লিপ্ত থাকে। আহার বিহার-শয়ন-দান-সঞ্চয়-ক্ষয়-লাভ এই সকল বিষয়ে মনোযোগ থাকিলে, বিষয়ীর ভাব তাহার মনে বর্তমান রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। বিষয়বস্তুতে লক্ষ্য রাখিয়া সম্পূর্ণ যে যত অনাসক্ত হইবে, সে তত সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সৎস্মরণে থাকিবার জন্য বৈরাগ্য জীবন। বাহ্যমুক্তি যাহাতে হয় তাহারই জন্য শুধু সাধনা বা একাগ্র কর্মচেষ্টা। কর্ম জীবনে যে যত বিষয় চিন্তা মুক্ত হইয়াছে, সেই সুফল লাভ করিতেছে।

বৃথা বাহ্যাড়ম্বরে লোকচক্ষে উন্নত পুরুষের পরিচয় না দিয়া, স্বাভাবিক সৎ সরল ভাব অবলম্বন করিয়া ধর্মপথে যাহাতে সকলের অগ্রগতি সুগম হয়, সেইরূপ নির্লিপ্ত অনাসক্ত পুরুষই গৌরবের পাত্র। সাধকের যাচ্ঞার বস্তু কিছু নাই। কেবল সৎ সংযোগে যুক্ত থাকিয়া প্রত্যক্ষ অন্তরানুভূতি লাভ এবং আত্মানন্দে আত্মহারা থাকিয়া সচ্চিদানন্দে মগ্ন থাকিয়া বিশ্বমাঝে বিশ্বরূপ দর্শন করা, ইহাই সুকর্ম ফল লাভ।

মন বাহ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইলে বিষয় বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

সৎ স্মরণ অন্তরে, সদালাপ বাহিরে, ইহার ব্যতিক্রম হইলে, পদযুগ ধরিয়া শতমুখী বাসনা রসাতলে সত্বর লইয়া যাইবে। এতাদৃশ ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। নিম্নে যাইবার পথ দুর্বল মনের পক্ষে প্রশস্ত ও আকর্ষণীয়। সৎপুরুষ চিন্তায় উন্নত, বাহ্য কর্মে নির্লিপ্ত থাকায় গতি ধীর হইলেও পদক্ষেপ স্থির, মন অচঞ্চল রহিবে। সজ্জনের কার্য দ্বারা কেবল স্বার্থসিদ্ধ হয় না, তাহার দ্বারা জগতের বিবিধ কর্ম সাধিত হয়। বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভিষ্ট লাভ করিয়া ভাগ্যবান মনে করে।

সৎস্মরণে গভীর চিন্তনে দেহ-মন পবিত্র আধারে রক্ষিত হয়। কুচিন্তা বা অসৎকর্ম দ্বারা সে শরীর অস্পৃশ্য থাকে। শুদ্ধকায় অপ্রাকৃত পুরুষ দৈব সম্পদের অধিকারী হয়।"

বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ সালে চক্রবর্তীবাবা দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে কুটীরে

বাস করিতেন, সেই গৃহমধ্যে তাঁহার নশ্বরদেহের সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তাঁহার সমাধির উপরিভাগ স্বল্পোচ্চ ইষ্টক দ্বারা গাঁথা হইয়াছে। অল্পকাল হইল তাঁহার সমাধি উত্তমরূপে সংস্কার করা হইয়াছে।

চক্রবর্তীবাবা একনিষ্ঠ সাধনায় রত হইয়া, জাগতিক লোকসম্বন্ধ হইতে লুক্কায়িত থাকিয়া, আত্মভোগেচ্ছায় নিস্পৃহ রহিয়া দৈহিকক্লেশ ও দুঃখবিষয়ে উদাসীন হইয়া, একমাত্র দেবআরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, নিজ সঙ্কল্পিত ভগবৎ কৃপালাভ সম্ভব হউক নতুবা দেহান্তে ভূগর্ভে সে দেহ সমাধিস্থ হউক এইরূপ দৃঢ়চিত্তে তিনি কঠোরব্রতে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকিয়া ভবিষ্যৎ দর্শনলাভে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বাকসিদ্ধ, কর্মযোগী, বাসনা মুক্ত, বিষয়ে নির্লিপ্ত অবস্থায় কিছুকাল এ তীর্থে বহু মান্য হইয়া উন্নতস্থানমাহাত্ম্যের গৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন।

দেহ ও মনোব্যাধিপীড়িত আগন্তুকগণকে চক্রবর্তীবাবা বহুভাবে সদুপদেশ বা জ্ঞান দান করিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন। সামান্য বা দুঃসাধ্য বৃহৎ দুর্ঘটনা ঘটিলে চিন্তামুক্ত হইতে, বহুজন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার আশ্রিত জন সংসার জীবনে শান্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত।

যাঁহার নিকট গেলে মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া, তাঁহার আশ্বাসবাণী পাইয়া শরণাগত ব্যক্তি বহু সময় তাঁহার নিকট উপকৃত হইত। স্বল্পদানের আশায় কোনো দরিদ্র দুঃখী তাঁহার নিকট দাঁড়াইলে তিনি তাহাকে নিরাশ করিতেন না। অধিক বাক্যালাপে স্পৃহাশূন্য অক্রোধী তেজস্বী বীর সাধক চক্রবর্তীবাবা সত্য উক্তিতে কদাপি সঙ্কুচিত হইতেন না।

একস্থানে একাসনে থাকিয়া চক্রবর্তীবাবা জনকল্যাণসাধনে জীবনব্রত করিয়া প্রিয়অপ্রিয় সকলকে নিকট করিয়া বহুক্ষেত্রে তিনি বিপন্ন ব্যক্তিকে ভ্রাতৃ বন্ধনে বদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এক প্রেমের সংসার ও ধরিত্রী শান্তির ভূমি, এই ভাবে বিভাবিত হইয়া, বিভূতিভূষিত বক্রনাথ এবং কল্যাণী দেবী মহিষমর্দিনীর চরণপ্রান্তে চক্রবর্তীবাবা আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ব্যোমানন্দ সরস্বতী :—ব্যোমানন্দবাবা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অধ্যায়ন সমাপনান্তে ডাকবিভাগে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রাদি জন্মাইবার পর সকলকে শিক্ষাদান ও বিবাহ দিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় সংসারে থাকিলেও অবসর পাইলে মধ্যে মধ্যে তিনি তীর্থ ভ্রমণে যাইতেন।

স্ত্রী বিয়োগের পর কর্ম জীবন হইতে অবসর লইয়া কয়েকটি তীর্থভ্রমণের পর তিনি বক্রেশ্বরে আসিয়া এক কুটির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বক্রনাথ মন্দিরের

প্রবেশদ্বারের উত্তরে শ্বেতগঙ্গার জলনিষ্কাষণের পয়ঃ প্রণালীর দক্ষিণে তিনি স্বনির্মিত আবাসস্থানে থাকিতেন। পূর্বাপর এই এক স্থানে তিনি বাস করিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি ঐ গৃহে বাস করিতেন এবং এক সেবায়েত গৃহে মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া আসিতেন।

ব্যোমানন্দবাবার দীর্ঘ আকৃতি সরল সুঠাম দেহ ছিল। প্রথমাবস্থায় তিনি গৈরিক দেহাবরণ ও বহির্বাস পরিধান এবং হস্তে এক দণ্ড লইয়া ঘুরিতেন। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ উজ্জ্বল বর্ণ, মস্তকে জটা লইয়া সগৌরবে তিনি বিচরণ করিতেন এবং অধিক সময়ই তিনি স্বআসনে আত্মকর্মে ব্রতী থাকিতেন। নদীরতীর বা অপর জনশূন্যস্থানে তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তিনি অধিক কাল নিজআসনে থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই গ্রামের এক সেবায়েত তাঁহার সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ব্যোমানন্দবাবার শেষদিন পর্যন্ত এই সেবায়েতই তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। বাবার তিন পুত্র মধ্যে মধ্যে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তাঁহার মস্তকের জটা এবং শ্মশ্রু দীর্ঘ ছিল। পরে তিনি তাহা মুণ্ডন করাইয়াছিলেন।

কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলে, ব্যোমানন্দ বাবা তাঁহাকে এ তীর্থে কুমারী ভোজন করাইতে বলিতেন। ইহা তাঁহার নিকট আনন্দদায়ক ছিল। শারদীয় দুর্গাষ্টমী এবং শিব চতুর্দশীর পরদিন কুমারী ও কয়জন ব্রাহ্মণভোজন তিনি করাইতেন। কখন ছাগবলি দিয়া তাহাও ঐ সেবার নিমিত্ত রন্ধন করা হইত। কলিকাতা হইতে শঙ্খের পাত্র আনাইয়া তাহাতে করিয়া তিনি কারণবারি পান করিতেন।

একবার ব্যোমানন্দবাবার নিকট তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধুগণ আসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা ঘরে ফিরিয়া চলুন, আমরা তথায় আপনার সেবা করিব।"

তদুত্তরে পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন "পুনরায় মায়ার মধ্যে কি কারণে যাইব? তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।" এই বাক্য বলিয়া তিনি তাহাদের বিদায় দিয়াছিলেন।

কোনো লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজভাগ্য বা কর্মের ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইবে কিম্বা সুফল লাভ হইবে না, তাহা বলিয়া দিতেন।

একজন বিচারালয়ে কোন ঘটনায় লিপ্ত হইয়া ব্যোমানন্দ বাবার নিকট আসিয়া সকল কথা নিবেদন করিল এবং বলিল, "আদালতের বিচারে আমার পরাজয় হইলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব সে কারণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।"

ব্যোমানন্দবাবার কৃপায় সে ব্যক্তি বিচারকের সুবিচারে জয়লাভ করিয়াছিল।

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মধ্যে মধ্যে সেই লোকটি তাঁহার সেবার জন্য নানা দ্রব্যাদি দিয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিত।

বক্রেশ্বরনদীর উত্তরতীরবর্তী গোয়ালিয়ারা গ্রামের ভক্তগণ মাগুর মাছ, বলির ছাগমুণ্ড বা মাংস কখন পক্ক, কখন অপক্ক অবস্থায় তাঁহার সেবার জন্য লইয়া আসিত। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার সেবার জন্য কারণ প্রয়োজন হইত। তাঁহার সেবক দোকান হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

এক সময় বর্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদমহতাব বাহাদুর বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনে আসিয়াছিলেন। ব্যোমানন্দবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজা তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তদুত্তরে ব্যোমানন্দবাবা বলেন, "আমি আপনার প্রজা আমি আপনার নিকট কোনো অর্থ লইব না।"

সেই বাক্য শুনিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, "কুমারীভোজনের জন্য আপনার নিকট কিছু অর্থ দান করিতেছি।" তাহাতে ব্যোমানন্দবাবা সম্মতি প্রকাশ করেন।

তদানীন্তন বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল বক্রেশ্বর দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি এই তীর্থের প্রাচীন সাধু ব্যোমানন্দ বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পরস্পর ইংরাজী ভাষায় বাক্যালাপ হয়। ঐ সময় ব্যোমানন্দবাবা লাট বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন, "তিন বৎসর হইল আমার পেনসন বন্ধ হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলে আমি আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।"

এই কথামত লাট বাহাদুরের চেষ্টায় পূর্বের সকল পেনসন যুক্ত করিয়া এক কালীন অর্থ তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যোমানন্দবাবা পেনসন পাইয়াছিলেন। পেনসনবিভাগ মনে করিয়াছিল এরূপ দীর্ঘায়ু পুরুষ কেহ থাকিতে পারে না, অতএব উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত। এই অনুমানেই ব্যোমানন্দ বাবার পেনসন বন্ধ হইয়াছিল।

সরকারী পেনসনের অর্থ দ্বারা তাঁহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হইত। ভক্তগণ দ্বারা প্রদত্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, পরে সুবিধামত কুমারীভোজন বা অপর সৎব্যয় করিতেন।

ব্যোমানন্দ বাবাকে এক ভক্ত বলিয়াছিল, "আপনার বাসস্থানের এই কুটীর ইষ্টক নির্মিত করিয়া দিব। কারণ প্রতি বৎসর খড় দ্বারা আচ্ছাদন করিতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে।"

তদুত্তরে ব্যোমানন্দবাবা বলেন, "বাবা! সকল সময় ঘরে থাকিতে হয়, মাটির ঘর খড়ের আচ্ছাদন, সময়ে শীতল অন্য সময়ে গরম হয়, ইহাই ঋতুভেদে দেহের পক্ষে শান্তিদায়ক। ইহার কোনো পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন নাই।"

কখনো কোনো সাধু ব্যোমানন্দবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে প্রয়োজনবোধে তিনি নিজ শয্যার নিম্নভাগে রক্ষিত স্থান হইতে লইয়া যেমন বুঝিতেন তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। শেষাবস্থায় তিনি কানে কম শুনিতে পাইতেন। সেইজন্য তাঁহার কানের নিকট সজোরে কথা বলিলে তবে তিনি উত্তর দিতেন। এরূপ বাক্যালাপ কোনো পক্ষে সুখকর না হওয়ায় দর্শকের নিকট অল্প বাক্যেই নিজ বক্তব্য সমাধা করিতে হইত। সুদীর্ঘকাল নিজ আসনে অধিকক্ষণ কর্মযোগে উপবিষ্ট হইয়া থাকায় ব্যোমানন্দ বাবার দেহ, জানু ও পদ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহার অসুবিধা হইত।

ব্যোমানন্দবাবার ঘরের পূর্বে একটি গুলঞ্চফুলের বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। তিনি বলিতেন, "ঐ বৃক্ষ আমার সঙ্গে কথা বলে।"

কোনদিন বিশেষ কিছু পাক হইলে ব্যোমানন্দবাবা বলিতেন, "ঐ গুলঞ্চ তরুতলে পক্কদ্রব্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া দাও।"

কোনো কোনো সময় সংহতচিত্ত ব্যোমানন্দবাবা আপনমনে নিজভাবে উচ্চ কণ্ঠে একক ঘরে কথা বলিতেন। বহির্ভাগে সেই কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইত।

জনৈক নারীর দর্শনশক্তি হ্রাস পাওয়ায় সে কাতর হইয়া ব্যোমানন্দবাবার শরণে আগত হয়। তিনি তাহাকে বক্রনাথের চরণামৃত চক্ষুতে দিতে বলিয়াছিলেন। ভগবৎ কৃপায় বিপন্ননারী সাধুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করিয়া ব্যোমানন্দবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উক্ত নারীকে কুমারীভোজন করাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা নারী সাধুবাক্য পালন করিয়াছিলেন। সৎকর্মে একনিষ্ঠ ব্রতী হইয়া ব্যোমানন্দবাবা বাহিরে কাহারও সহিত অধিক মিলনের ইচ্ছা করিতেন না। দিবারাত্র বেশী সময়ই নিজ আসনে উপবিষ্ট রহিতেন। মধ্যাহ্নকালে সেবার জন্য সেবক ব্রাহ্মণ আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে একপার্শ্বে পাক করিতেন। তিনি আসন হইতে ঐ সময় উঠিয়া শৌচাদিস্নান আহার সকলি পরপর একই কালে সম্পন্ন করিতেন। দর্শনেচ্ছু কেহ ব্যোমানন্দবাবার নিকট আসিলে ঐ সময় তাঁদের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইত।

ব্যোমানন্দবাবা বাহ্য কর্ম ও চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মযোগে যেরূপ বদ্ধ রহিতেন, আধুনিকযুগে এতদঞ্চলে সেরূপ যোগী অতি বিরল। তিনি দিবারাত্র

রুদ্ধদ্বারে একাসনে নিজকর্মে রত থাকিতেন। বৃথাবাক্যে কখনও কালক্ষেপ করিতেন না বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই মহাযোগী মহাতপস্বী সর্বদাই বাহ্যে মুক্ত অন্তরে সৎসংযোগী অবস্থায় শেষদিন পর্যন্ত যাপন করিয়াছিলেন। কোনো আগন্তুক দর্শনেচ্ছায় ব্যোমানন্দবাবার নিকট আসিলে মধ্যাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ লইতেন। বহু সময় দেখা যাইত তিনি নিজ আসনে করজপ করিতেছেন। গিরি গহ্বর বা নির্জন অরণ্যবাসী যোগিগণ যেভাবে কাল অতিবাহিত করেন, তিনি এই তীর্থে সদা-সৎনামে যুক্ত থাকিয়া তদ্রূপ কর্ম সাধন করিতেন এবং বাহ্যে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকিতেন।

ব্যোমানন্দবাবা আগন্তুক রোগী-ভোগী-দর্শনাকাঙ্ক্ষীর প্রতি মনোযোগ না দিয়া নিজকর্মে সদাযুক্ত থাকিবার চেষ্টা অধিক করিতেন। এই নীরব সাধক যোগীবর লোকসমাজে খ্যাতি বা অর্থাগমের আশা কোনদিন মনে পোষণ করেন নাই। স্বল্পভাষী হওয়ায় স্বার্থান্বেষী লোক তাঁহার নিকট গতায়াত অল্প করিত। তাঁহার উচ্চ উন্নত হৃদয়, সর্বদা মানসপটে বদ্ধ থাকায় অন্তরে দেব লোকে তিনি বিরাজ করিতেন। পার্থিবসুখসম্পদের কোন লিপ্সা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। এই উন্নত পুরুষের পবিত্র চিন্তাই প্রাণে আনন্দ দান করিত এবং তদ্দ্বারা তাঁহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সদাসৎ যোগে থাকায় যে অমৃত আস্বাদেমগ্ন থাকিতেন, তাহাতেই এই চিন্ময়ধামে অমৃতময়দেহ ধারণ করিয়া, নির্মল সুধা ধারায় নীরবকর্মী এই অনাসক্ত পুরুষ নিমগ্ন থাকিতেন। সেই জন্য বিষয়ীর সমাগম, বহিরাগন্তুকের বৃথা উপদ্রব হইতে মুক্ত থাকিবার অবসর তিনি লাভ করিতেন।

ব্যোমানন্দবাবা বহির্জগতে কি ঘটিতেছে, কাহার কি হইয়াছে, এরূপ বাক্যা-লাপে কদাচিৎ মন দিতেন। তিনি আত্মানন্দে লীন থাকিয়া অপরিমিত সুখে নিমজ্জিত থাকিতেন। বহির্জগতের লোক সেই জন্য তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবার বিশেষ সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে তাঁহার সম্মান বিশেষ ছিল না। এই কর্মযোগী পুরুষকে গৌরবদানে কদাপি কেহ নিকটস্থ হইলে তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকিয়া, আত্মকর্মে নীরবে একান্তে দিবারাত্র সমভাবে কালাতিপাত করিতেন। নিন্দা, বৃথাবাক্য অথবা জ্ঞানপ্রকাশের বাচালতা করিতে তাঁহার অবকাশ হইত না। তিনি জ্ঞান ও গুণের আধার হইয়া, জীবনে বহুকর্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে এই ভাবিয়া, বাহ্য হইতে মুক্ত থাকিয়া, অন্তর্মুখী হইয়া সদানন্দে থাকিতেন।

ব্যোমানন্দবাবা দেহধারণ অবস্থায় এই শিবলোকে বাস করিয়া পরাভক্তি জ্ঞানদাতা যোগীবর রুদ্রনাথ বক্রনাথ দেব এবং মোক্ষদা যোগমায়া যোগেশ্বরী রুদ্রাণী অভয়া মহিষমর্দিনীর সান্নিধ্য লাভে সর্বদা পরমানন্দে থাকিতেন। যিনি ঊর্ধ্বে বা অন্তরে সৎ চিন্তায় সদা বিরাজ করিতেন তাঁহার সহিত বাহ্য পার্থিব সুখে লিপ্ত ব্যক্তির সংস্রব অতি বিরল ছিল। সেই কারণে এই উন্নত মহাপ্রাণ যোগীর পরিচয় অধিক লইবার সুযোগ বিশেষ কেহ পায় নাই। দুরন্ত গ্রীষ্ম বা প্রচণ্ড শীতে কাতর না হইয়া স্বাভাবিকভাবে থাকিয়া কোনরূপ বাহ্য চাঞ্চল্যের প্রকাশ না করিয়া তিনি নীরবে থাকিতেন। শান্ত সৌম্য মূর্তি মিতভাষী উপরিউক্ত মহাযোগী মহানন্দে কাল কাটাইয়া আত্মতৃপ্ত হইতেন। এই তপোভূমিতে কঠোর তপস্বী নির্জনে একান্তে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বক্রেশ্বরতীর্থে যে-সাধুব্যক্তি নিজ কর্ম নিয়মনিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন ব্যোমানন্দবাবা তাঁহাকে তাঁহার কার্যের জন্য ভালবাসিতেন। সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবৎ আশ্রয় লইয়া, নিজে যেরূপ একমাত্র দেবাশ্রয় করিয়া, দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন, সেইরূপ এই পথ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সৎ কর্মে যুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের স্বধর্ম পালনের জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ ও উৎসাহিত করিতেন।

সংসারী লোকে বিষয়কর্মে থাকিয়া নিজ কার্য ও চিন্তা যেরূপ করে আত্ম-ত্যাগী ব্যোমানন্দবাবা তাহাদের তদ্রূপ সৎধর্ম পালন করিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইতেন। গৃহত্যাগ করিয়া যদি সেরূপ বৈরাগ্যবান পুরুষ সাধুজনোচিত আচরণ না করে, তবে তাহার এ পথে আসিয়া কোন কর্ম সুফল হইল না এইভাবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। লোকে গৃহে থাকিয়া বিষয় কর্ম সংসারে বিভিন্ন সুখ লাভের আশায় অধিক ধনবৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের জন্য নানাক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু পথ অবলম্বন করে। সংসার দুঃখ নিবারণ করিতে লোকে গৃহত্যাগ করিয়া সৎপথ আশ্রয় লয়। কিন্তু সন্ন্যাস জীবনেও সৎব্রতী না হইয়া পূর্বগৃহস্থাশ্রমের ন্যায় যদি কেহ বিষয়ীর মত আচরণ করে তবে তাহার জন্য তিনি দুঃখিত হইতেন। আশ্রমের কর্ম মনেপ্রাণে ঐক্য বজায় রাখিয়া না করিলে, সংসারত্যাগ বৃথা হইল এইরূপ অনুতাপ পরের জন্য তিনি করিতেন।

পূর্বে কত মুনি-তপস্বী কর্মজীবনে ধর্ম প্রধান সাধন, এই জ্ঞানে অধিক সময়ে একনিষ্ঠ হইয়া সংযত জীবনে আত্মোন্নতি লাভ ও সত্যের সন্ধান করিয়া জগতে বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিয়া কেবল উদরভরণে মনোযোগ দিয়া, দৈহিক সুখলালসায় চতুর্দিকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ধর্মার্জনে

অবহেলা করা নিন্দনীয় জ্ঞানে যথাসম্ভব সেই ত্যাগব্রতীকে সংযত হইতে আত্মারাম ব্যোমানন্দবাবা নিজ আচরণ দেখাইয়া উপদেশ দিতেন। কেবল মাত্র আহার বিহারে সুখলাভ সাধু জীবনে প্রধান লক্ষ্যের বস্তু নহে। অধিক ধর্মাচরণ ও নীরবে সংস্মরণে কাটাইয়া আত্মোন্নতি করা প্রধান কর্ম—এই তাঁহার শিক্ষা ছিল।

গৃহত্যাগ করিয়া সাধু বৈরাগ্য জীবনে আসিয়া, কেহ মান কেহ অর্থ কেহ ভোগ সুখ কামনা করিয়া বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। আবার কেহ সর্বত্যাগী উদাসী হইয়া দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া কেবল মাত্র ভগবৎ স্মরণে আত্মনিয়োগ করিয়া, আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন। এই পথ বৈরাগ্যজীবনে অবলম্বনীয় ও আচরণীয়। অন্য চিন্তা, কার্য বা বিষয়ীর সংস্রব বর্জন করিবার চেষ্টা করিতে তিনি বলিতেন। গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া গৃহস্থের আচরণ করিলে তিনি বলিতেন, "বাবা! গৃহে ফিরিয়া যাও, ভিক্ষান্নে ভোগলালসা কি কারণে পূর্ণ করিতেছ। এ আচরণ প্রতারণাও পাপ। কেবল দেহরক্ষার্থে যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ ভিক্ষা করিবে ইহাই ধর্ম।"

শতবর্ষের অধিক কাল ব্যোমানন্দবাবা জীবিত ছিলেন। তিনি দেহরক্ষার পূর্বে স্থানীয় সেবায়েত ভোলানাথ আচার্যের মাতার নিকট এবং মুক্তিপুর গ্রামের কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট মোট একশত টাকা রাখিয়াছিলেন। ঐ অর্থ তাঁহার সৎকার কার্যে ব্যয় করিবার জন্য রক্ষিত ছিল।

তিনি দেহ রক্ষা করিবার দুই দিন পূর্বে অন্নসেবা করেন নাই। এক দিন কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করেন, পরদিন তিনি কিছুই সেবা করেন নাই। ঐ দিন রাত্রিতে তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। যেদিন দেহরক্ষা করেন সেই দিন অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি ২৮শে আশ্বিন ১৩৫০ সালে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্বেতগঙ্গার উত্তরভাগে তাঁহার শেষ দেহের সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। দেহরক্ষার পর সমাধি হইলে গ্রামস্থ মোদকের দোকানে ব্রাহ্মণদের লুচি, ফলাহার করানো হয় এবং তাঁহার কুটিরে রক্ষিত উত্তম মদ্য কেহ কেহ সেবা করেন। দরিদ্রদিগকে অন্ন সেবা করানো হয়। তাঁহার রক্ষিত অর্থ হইতে এই সকল ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রদের সংবাদ দিলে পরে তাঁহারা আসিয়াছিলেন এবং ব্যোমানন্দবাবার সমাধির উপরিভাগ ইষ্টকদ্বারা পাকা করানো হয়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও অপর ব্যক্তিদিগকে এই উপলক্ষে তাঁহারা সেবা করাইয়াছিলেন।

* * * * *

তীর্থের প্রাচীন আখ্যান লিখিবার সময় বিভিন্ন ভিত্তির সন্ধানের সুযোগ সম্পূর্ণ না ঘটায় কিছু পৌরাণিক কাহিনী, কিছু লোককথিত বর্ণনা এবং দৈবের উপর নির্ভর করিয়া গভীর চিন্তাদ্বারা যে-ভাবস্রোত মনোমধ্যে আগত হইয়াছে তাহাই এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইল। যাহা কল্পনাপ্রসূত, ভিত্তিহীন তাহা নীরস হয় এবং তাহা চিত্তাকর্ষী হয় না। সত্যের উপর আশ্রয় করিয়া, স্থির চিত্তের অনুভূতি হইতে যাহা উদ্ভূত হয় তাহা কদাপি অবিশ্বাস্য নহে। মহাজনগণ পূর্বাপর স্থির চিন্তাদ্বারা যে সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাই প্রচারিত হইয়াছে। একাগ্র আরাধনা দ্বারা যে সত্য জ্ঞাত হইবার সুযোগ আসে তাহাই প্রকাশযোগ্য।

যে ঘটনাবলী পর পর ঘটিয়াছে তাহা লিখিত থাকায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংযোজনা দ্বারা উহা ইতিহাস আখ্যালাভ করে। দীর্ঘকাল অতীত গর্ভে যাহা লীন হইয়াছে, কালের ঘাত প্রতিঘাতে যেসকল সূত্র ছিন্ন হইয়াছে, কালের কবলে যে সকল ঘটনা লুক্কায়িত হইয়াছে, তাহার আদি অন্তের সংযোগ বহু ক্ষেত্রে লাভ করা সম্ভব হয় না।

সত্যানুরাগী আরাধক সৎযোগে স্থির থাকায় একাগ্রতা দ্বারা সত্যের বিকাশ তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিফলিত হয়। সে অবস্থায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঘটনা জ্ঞাত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ ব্যক্তির চিন্তাধিগম্যের অতীত হওয়ায় সেই সত্য বাক্য সকল সময় তাঁহাদের বিশ্বাস হয় না। দৃঢ় চিত্তে সরল বিশ্বাসে সৎপুরুষ সন্মার্গী অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্ম উপলব্ধিতে যাহা লাভ করেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে তিনি অগ্রসর হন।

কাব্য-উপন্যাস-কাহিনী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ভাববস্তু থাকিলে তাহাও মধুর হয়। তবে বিশেষ স্থান সম্বন্ধে বা বিশিষ্ট লোকবিষয়ে লিখিতে হইলে যথাসম্ভব তথ্যসংগ্রহ করা আবশ্যক এবং যথাযোগ্য মূলচিন্তা ও গবেষণাদ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। এরূপ আখ্যান অবাস্তব ভিত্তিহীন কাল্পনিক বা অযৌক্তিক বলা আশ্চর্য নহে, তথাপি কার্যকারণ দেখিয়া সন্ধানের সূত্রগুলি বিবেচনাদ্বারা মীমাংসিত হইলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

পরমার্থিক বা অপার্থিব ঘটনা আলোচনার বিষয়বস্তু না হইলেও পরলোকগত মহাপুরুষগণের জীবনআখ্যান লিখিত এবং তাঁহাদের স্মরণে তৎকৃপালাভে প্রাচীন ঘটনা যেভাবে মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। ইহাতে লিপিকৌশল অথবা বৈচিত্র্যব্যাপার প্রকাশে কলা নিপুণতায় পরিচয়

দান করিতে কিছুই লিখিত হয় নাই। কেবল মাত্র পবিত্র ক্ষেত্রের পুণ্যময় কাহিনী এবং তথায় আশ্রিত উত্তম পুরুষগণের মধুময় জীবনগাথা লোক মধ্যে প্রচারিত আখ্যায়িকা অবলম্বনে সতর্কভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আখ্যান বা তৎশ্রুত বাণী প্রকাশে বক্তা বা লেখক কেহ নিন্দনীয় নহে।

